মহানপুরুষদের সান্নিধ্যে

প্রাচী পাবলিকেশনস

প্রকাশক :   এইচ্ রায় চৌধুরী
৩/৪ হেয়ার স্ট্রীট (তেতলা)
কলিকাতা-৭০০০০১

প্রকাশ :   ১৯৪৯

প্রচ্ছদ :   শ্রীঅজয় ঘোষ

মুদ্রণ :
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী
কলিকাতা-৭০০০০৬

॥ সূচীপত্র ॥

বিদ্যাসাগর

আমার জীবনে সর্ব্বপ্রথম যে বিরাট ব্যক্তিত্বশালী পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিরূপে ইহা ঘটিয়াছিল, তাহাই আমি এখানে বিবৃত করিব। আমার পিতা তখন কলিকাতার সরকারী বেঙ্গলী স্কুলের শিক্ষক। তাঁহার সঙ্গে নয় বৎসর বয়স কালে আমি বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিলাম। আমার মাতুল পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের গৃহে আমার থাকিবার ব্যবস্থা হইল। উত্তরকালে ইনিই সুবিখ্যাত বাংলা সাপ্তাহিক পত্র, 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদক রূপে যশস্বী হইয়াছিলেন।

মাতুল মহাশয়ের তৎকালীন গৃহটি ছিল যেন একটি সার্ব্বজনীন আবাস। ছাত্র, চাকুরিয়া প্রভৃতি নানা বয়সের নানা বৃত্তিযুক্ত বিচিত্র লোক দ্বারা সর্ব্বদা এ স্থানটি পূর্ণ থাকিত, আমার মত ক্ষুদ্র বালককে সবাই সর্ব্বদা আদর-যত্ন ও স্নেহ-সম্ভাষণ করিতেন। কিন্তু আমি যেন ইহার মধ্যে হাঁফ ছাড়িবার জায়গা খুঁজিয়া পাইতাম না। সমগ্র আবাসটিতে একটিও স্নেহমধুর নারী-মূর্ত্তি নাই—মাতৃস্নেহবিচ্ছিন্ন, আমার মত বালকের পক্ষে তাহা ছিল অসহ্য রকমের ফাঁকা ও অবসাদকর। শুধু তাহাই নয়, এই মেস-জীবনের সংস্পর্শ আমার মতন বালকের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে, এ আশংকাও নিতান্ত কম ছিল না। কারণ, গার্হস্থ্য পরিবেশবর্জ্জিত এই লোকগুলির মধ্যে কয়েকজনের জীবনে নৈতিক আদর্শের বালাই বড় একটা ছিল না।

সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে, আমাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল, যেখানে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অধ্যক্ষরূপে বিরাজিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন কলিকাতার তরুণদের আদর্শ পুরুষ, এক বিরাট প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের তিনি অধিকারী।

আমরা যখন কলেজে ঢুকিলাম, তখন সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরীয় যুগ চলিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের বহু রীতিনীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, পূর্ব্বের ন্যায় আর ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্র ভিন্ন অপরাপর জাতির ছাত্রকে প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ দিয়া আর ছেলেদের শিক্ষা আরম্ভ করা হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নূতন ভঙ্গীতে লিখিত বোধোদয়, কথামালা ও উপক্রমণিকা ইহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য, তখন পর্য্যন্ত কলেজের রক্ষণশীল পণ্ডিতগণ এই বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেছিলেন, ইহা আমরা লক্ষ্য করিতাম। তৃতীয়তঃ, অবৈতনিক শিক্ষার

পরিবর্ত্তে বেতন প্রদানের প্রথা তখন অনুসৃত হইতেছে। চতুর্থতঃ, বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের উচ্চতর শ্রেণীতে ইংরেজী শিক্ষাদানের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

এই সমস্ত পরিবর্ত্তন সাধন ও আলোড়নের মধ্যে ভর্ত্তি হইলাম। সমালোচনা ও বাগ্‌বিতণ্ডার ধূলিঝঞ্ঝা তখন নিম্নতর ক্লাসগুলিতেও মাঝে মাঝে ছড়াইয়া পড়িত। ইহা ছাড়া,বিধবা বিবাহের বিরোধী দলের বিক্ষোভ তখন বাংলার সমাজে এবং বিশেষ করিয়া সংস্কৃত কলেজে চাঞ্চল্যের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। বিদ্যাসাগর ইহার সমর্থনে পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন এবং প্রধানতঃ তাহার ফলেই সরকার কর্ত্তৃক বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয়। এই সময়ে সমগ্র শিক্ষিত সমাজ এবং বিশেষ করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ সংস্কারকামী এবং ইহার বিরোধী—ক্রমে ক্রমে এই দুইটি বিবদমান দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তখনকার দিনে সংস্কৃত কলেজই ছিল এই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের প্রধান ক্ষেত্র—আর আমরা নূতন ছাত্রের দলও মাঝে মাঝে বিদ্যাসাগরের পক্ষ ও বিপক্ষের সমর্থনে এই কলহে জড়িত না হইয়া পারিতাম না। আমি তো প্রথম হইতেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সমর্থক হিসাবে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লই। হয়তো ইহার একটি প্রধান কারণ—বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহপাঠী। তাছাড়া, তিনি আমার পিতা শ্রীযুক্ত হরানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সতীর্থ এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

পণ্ডিত বিদ্যাসাগর সপ্তাহে দুই তিন দিন আমাদের আবাসে আসিতেন, পিতা এবং মাতুলের সঙ্গে তাঁহার নিজের প্রিয় পরিকল্পনাগুলি নিয়া নানা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। সে সময়ে ঐ আবাসে আমিই একমাত্র ক্ষুদ্র বালক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টি তাই আমার উপর অতি সহজে পতিত হয় এবং আমি তাঁহার স্নেহ লাভে ধন্য হই। ক্রমে আমি তাঁহার এক অন্তরঙ্গ ও আদরের পাত্ররূপে পরিগণিত হইলাম।

আমাদের গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই তাঁহার কাজ ছিল আমাকে খুঁজিয়া বাহির করা। তারপর তিনি আদর করিয়া আমার গালে দুই একটি টোকা মারিয়া সোৎসাহে আমার পেটে দুই আঙ্গুল দিয়ে অকস্মাৎ খোচা মারিয়া বসিতেন। সে বয়সে আমি আবার কিছুটা স্ফীতোদর ছিলাম। কখনো কখনো তিনি আমাকে ধরিয়া কিছু কিছু মিষ্ট দ্রব্যও হাতে গুঁজিয়া দিতেন। আমাদের গৃহে তাঁহার ঘন ঘন যাতায়াত যেমন ঘটিত, তেমনি বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে তুমুল তর্কও কম হইত না। আর এইগুলি গলাধঃকরণ করিয়া আমি কলেজে গিয়াই তাহা উদ্‌গীরণ করিতাম। ফলে আমার সতীর্থ মহলে এক প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড় বহিয়া যাইত।

ইহার পর এই সমাজ সংস্কারের আন্দোলন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। ১৮৫৬ সালে বাবু রাজকৃষ্ণ ব্যানার্জীর সুকিয়া ষ্ট্রীটের ভবনে প্রথম বিধবা

বিবাহটি অনুষ্ঠিত হয়। সেদিনকার সেই স্মৃতিটুকু আমার অন্তরে চিরউজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

সকলের সঙ্গে আমিও বিবাহের অনুষ্ঠান দেখিতে গেলাম। বিবাহ বাসরের দ্বারদেশে এক বিরাট শোভাযাত্রীদল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার পুরোভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বন্ধুবান্ধব এবং বিবাহের বরসহ বিরাজমান। অগণিত উৎসাহী দর্শকের ভীড়ে রাস্তায় তিল ধারণের স্থান নাই। তখনকার দিনে রাস্তার দুই পাশে গভীর নর্দ্দমার খাদ দেখা যাইত। সেই রাত্রিতে কৌতূহলী জনতার চাপে তাহার মধ্যেও অনেককে পতিত হইতে দেখা গিয়াছিল।

অনুষ্ঠান শেষে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতায় এক উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক চলিতে লাগিল। রাস্তাঘাট, পার্ক, বাজার, বৈঠকখানা সর্ব্বত্র নরনারীর মুখে একই বিষয়ের অবতারণা। শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ তো এক প্রকার শাড়ীই তৈয়ার করিয়া ফেলিল—যাহার পাড়ের মধ্যে বিদ্যাসাগরের দীর্ঘজীবন কামনাযুক্ত গানের কলি অঙ্কিত। সে সময়কার উদ্দিপনাময় সংস্কার যুগে এই জাতীয় গান প্রায়ই শুনা যাইত। এইরূপে এমন এক প্রাণবন্ত আন্দোলনের সৃষ্টি সে সময়ে হয়, যাহা আমাদের দেশে কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ ব্যানার্জীর গৃহে প্রথম বিধবা বিবাহানুষ্ঠান হইবার অল্প কাল পরেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত তৎকালীন জনশিক্ষা বিভাগের অধিকর্ত্তা মিঃ গর্ডন ইয়ং-এর মনোমালিন্য ঘটে।

সে সময়ে ইংরেজ রাজপুরুষগণ ভারতবাসীর মর্য্যাদা দান সম্পর্কে যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেন তাহা দেশপ্রেমিক ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মমর্য্যাদায় আঘাত না দিয়া পারে নাই। তিনি অবিলম্বে সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করিলেন না,—যদিও তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, তাঁহার ভাগ্যে অদূর ভবিষ্যতে নিদারুণ অভাব অনটনই অপেক্ষা করিতেছে। উচ্চ চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি নানা প্রকার অস্বচ্ছলতার মধ্যে দিন অতিবাহিত করিতে থাকেন এবং এই সময়েই তিনি বিধবা বিবাহ পুনঃপ্রবর্ত্তনের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই আন্দোলনে বিদ্যাসাগর এমন ভাবেই জড়িত হইয়া পড়েন যে, ইহার দুই তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য হইতে আমি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাই।

অতঃপর মাতুলের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র সোমপ্রকাশের সম্পাদকমণ্ডলীতে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ায় তিনি প্রায়ই আমাদের বাসায় আসিতেন। কিন্তু কিছুকাল পরে মাতুল পত্রিকাখানির সম্পাদক ও মালিক হওয়ায় ক্রমে তাঁহার যাতায়াত কমিয়া যায় এবং ইহার পর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আমার মাত্র

কয়েক বার সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু যখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে তখনই তাঁহার অকৃত্রিম ও অফুরন্ত স্নেহলাভে নিজেকে ধন্য মনে না করিয়া পারি নাই।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আমার সহপাঠী পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রথমা পত্নী বিয়োগের পর শোকসন্তপ্ত চিত্তের সান্ত্বনাও ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের ধারা সম্পর্কে আমার সহিত আলাপ আলোচনা করিতে আসেন। যোগেন্দ্রের আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছা, তিনি আবার বিবাহ করেন।

বিধবা বিবাহের অনিবার্য্য প্রয়োজনীয়তা তখন দেশের প্রায় প্রত্যেক তরুণের মনেই আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। যোগেন্দ্র বলিলেন, তিনি বিধবা বিবাহ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই উদার মনোবৃত্তিকে আমি খুবই প্রশংসা করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে একটি মনোমত হিন্দুবিধবা কন্যাও জুটিল। কিন্তু সে সময়ে রক্ষণশীল সম্প্রদায় এতই বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে যে, স্বাধীন ভাবে আমরা এই অনুষ্ঠান করিতে সাহস পাইলাম না। তাই অবশেষে বিপন্নের বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্রের শরণাপন্ন না হইয়া উপায় রহিল না।

আমাদের এই প্রচেষ্টার কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আনন্দ আর ধরে না। পুরোহিত আনয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া নিমন্ত্রিতদের ভূরিভোজন ও নবদম্পতির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উপহার ইত্যাদি সকল কিছুর ব্যয়ভার সানন্দে গ্রহণ করিলেন। বিবাহের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত দায়িত্ব লইয়া তিনি এমনই ব্যস্ত হইয়া রহিলেন যে দেখিয়া মনে হইল কন্যাদায় যেন তাঁহারই।

কিন্তু তিনি যে কেবল কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন তাহাই নহে, তাঁহার রসবোধও বড় সূক্ষ্ম ছিল। একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে ইহা বুঝা যাইবে। পূর্ব্বোক্ত বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি বন্ধু তাঁহার এক নবম বর্ষীয়া বালিকা কন্যাকে লইয়া উপস্থিত হন। পিতার আদেশে বালিকা পণ্ডিত মহাশয়কে প্রণাম করিলে তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন—"মা আয়ুষ্মতী হও। রাজার মত তোমার স্বামী হোক, তারপর বিধবা হয়ে আমার কাজ অগ্রসর হবার ক্ষেত্রটি তৈয়ার কর—অর্থাৎ আমি তখন যেন আবার বিধবা বিবাহ দেবার একটা সুযোগ পাই।"

তাঁহার এইরূপ কৌতুকপূর্ণ আশীর্বাদ শ্রবণে উপস্থিত সকলে উচ্চরবে হাস্য করিয়া উঠিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বালকসুলভ সরল হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"বন্ধুদের কন্যারা যদি বিধবা না হয়, তাহলে আমার আদর্শ বাস্তবে পরিপূর্ণ হবে কিরূপে, বলতো? সমস্ত সমাজ যেরূপ বিধবা বিবাহের

বিরুদ্ধে তাতে এরূপ ঘটনা ছাড়া আমার কর্ম্মসূচী কার্য্যে পরিণত হওয়া তো সম্ভব নয়।"

বিবাহ তো হইয়া গেল। কিন্তু ইহার পর বহুতর জটিল সমস্যা আসিয়া দেখা দিল। এই বিবাহের উদ্যোক্তাদেরও কম লাঞ্ছনার মধ্যে পড়িতে হয় নাই। নবদম্পতির কৃতকর্ম্মের শাস্তি হিসাবে সমাজ তাহাদের অপাংক্তেয় করিয়া রাখে এবং তাহাদের নিঃসঙ্গ জীবনের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য আমি তখন তাহাদের বাটীতেই বাস করিতে লাগিলাম।

আমাদের এই সংগ্রামময় জীবনের বেদনাক্লিষ্ট স্পন্দন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে সর্ব্বদাই প্রতিফলিত হইত। তাই শত কর্ম্মের মধ্যেও তিনি প্রতিদিন বা একদিন অন্তর আসিয়া হাস্যপরিহাসে, নিজের অতীত জীবনের ঘটনা বিবৃত করিয়া ও অন্যান্য কথাবার্ত্তায় আমাদের অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনাকে দূর করিয়া দিতেন। তারপর নূতন উৎসাহে আগামী দিবসের পাথেয় সঞ্চয় করিয়া আমরা আবার অগ্রসর হইতাম। তাঁহার সেই প্রাণখোলা হাসি আমাদের এই অপাংক্তেয় জীবনের সকল ব্যথা দূর না করিয়া ছাড়িত না।

কিন্তু একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের বাসায় আসিয়া বসিলে আমরা সকলেই একটু অবাক হইয়া গেলাম। আজ সেই হাস্যময় রসিক পণ্ডিত কোথায়? আমার বন্ধুর এক সম্বন্ধী তখন আমাদের সহিত বাস করিতেছিল। এই যুবকটি তাহার এক বন্ধুর নিকট বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটি অপ্রীতিকর মন্তব্য করে; বন্ধুটির নিকট হইতে ইহা জানিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিশয় ক্ষুণ্ণ হন। তিনি তখন বলেন,—"তার যদি সত্যিই কিছু বল্‌বার থাকে সে তো আমার কাছেই বল্‌তে পারে।"

সত্যকার মতামত ব্যক্ত করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্রুদ্ধ তো হইতেনই না বরং বক্তার সৎসাহসের অকুণ্ঠ প্রশংসাই করিতেন। কিন্তু কাহারো সম্পর্কে পরোক্ষ মন্তব্যের কথা শুনিলে তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। আমার বন্ধুর সম্বন্ধীটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্মুখে তাহার অপরাধ স্বীকার না করায় তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ও তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া ক্ষিপ্রপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমি তাঁহাকে কি করিয়া নিবৃত্ত করিব? একবার বন্ধুপত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি তখন এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন যে, আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিলেন না, উন্মুক্ত দ্বারপথে ঝড়ের বেগে তখনই বাহির হইয়া গেলেন। আমরা ঐ যুবকটীকে বিদ্যাসাগরের মত মহান পুরুষকে পরোক্ষে নিন্দা করার জন্য বারংবার তিরস্কার করিলাম। পরদিন তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য তাঁহার গৃহে প্রেরণ করা হইল। সেও ইতিমধ্যে তাহার অপরাধ বুঝিতে পারিয়াছে এবং লজ্জিত না হইয়া পারে নাই।

সে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহে উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং বন্ধুর সম্বন্ধীটি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। হঠাৎ একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বর কাণে যাইতেই পিছন ফিরিয়া দেখেন. বিদ্যাসাগর মহাশয় স্নেহাপ্লুতভাবে বলিতেছেন.—"জানি তুমি ক্ষমা চাইতে আসবে! কিন্তু আমায় তো দুদিনও অন্তত রাগ্ করে থাক্‌বার অবসর দিতে পারতে। আমি সবেমাত্র গতকাল রাগ করে চলে এসেছি, আর আজই সকালে তুমি ক্ষমা চাইতে এখানে উপস্থিত হয়েছ? রাগটা পড়বার সময়ও দেবে না? আমি তো কালই তোমাদের ওখানে যেতাম, তুমি আবার শুধু শুধু কষ্ট করে এলে কেন? বাপ্‌রে, তোমারা দেখ্‌ছি আমায় একটু রাগ করতেও দেবে না!"—অপরাধ স্বীকারের পূর্ব্বেই ক্ষমা মিলিয়া গেল।

ভক্তিবিগলিত চিত্তে বন্ধুটি সেদিন সব কথা আমাদের জানাইলেন। সিংহবিক্রম, তেজস্বী সমাজ সংস্কারকের কোমল অন্তরের স্পর্শটি পাইয়া আমরা অবাক হইয়া গেলাম।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের বাটীতে আগমন করেন। সে সময় নিকট প্রতিবেশী এক নাপিতের সপ্তম বর্ষীয়া বিধবা কন্যাটি আমার কোলে বসিয়া গল্প করিতেছিল। প্রবেশ করিয়াই এই অপরিচিতা বালিকাকে দেখিয়া তিনি ইঙ্গিতে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বালিকার পরিচয় দিলাম ও তাহার পুনর্ব্বিবাহের চেষ্টার কথাও জানাইলাম। এই শিশু কন্যার বৈধব্য জীবনের কথা শ্রবণ করিয়াই যেন তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বালিকার সুন্দর মুখখানির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। আমরা বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার দুই গন্ড বাহিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছে। তিনি মেয়েটিকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

যাইবার সময় আমাকে আদেশ দিলেন,—বালিকাটিকে বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দাও। তাহার বিদ্যাশিক্ষার সমুদয় ব্যয় তিনি বহন করিবেন—একথাও জানাইলেন। বালিকা ও তাহার মাতাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহার মাতার নিকট পাঠাইতে বলায় ইহার পরদিনই আমি উভয়কে তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া দেই।

তাহারা ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিল, তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ মাতাপুত্র শূদ্র মাতাপুত্রিকে যে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, সে অকৃত্রিম ভালবাসা অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। অবাক হইয়া ভাবিলাম, বিদ্যাসাগরের আচারনিষ্ঠ মাতৃদেবী এই শূদ্রাণীকে আশ্রয় দিতে তো এতটুকুও ইতস্ততঃ করিলেন না। মনে মনে প্রণাম করিলাম—এমন মা না হইলে কি আর এমন পুত্র জন্মে?

বিদ্যাসাগর মহাশয় যথারীতি পরদিন আমাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। বালিকার শিক্ষা ও বিবাহ সম্পর্কে আমার সহিত দীর্ঘ আলোচনা করিলেন। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। আমার বন্ধুর স্ত্রীটি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন ও কয়েকদিন রোগভোগের পর পরলোকগমন করেন। বিদ্যাসাগর আমার এই বন্ধুপত্নীটিকে খুবই স্নেহ করিতেন। তাঁহার রোগশয্যায় তিনি স্নেহপরায়ণ পিতার মতই বসিয়া থাকিতেন। তাঁহাকে সুস্থ করিবার কোন চেষ্টাই তিনি বাদ দেন নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি বাঁচিলেন না। এই মৃত্যু সকলকেই শোকাচ্ছন্ন করিল। মৃতার মা, ভাই ও আমার বন্ধুটির দেখা শোনার ভার আমার উপরই পড়িল। এই দুর্দ্দিনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদাজাগ্রত স্নেহকোমল মনটি সব সময়ই আমার সাহস ও শক্তি দান করিয়াছে। সময় পাইলেই তিনি এই শোকসন্তপ্ত পরিবারটির দুঃখ লাঘব করিতে ছুটিয়া আসিতেন।

বন্ধুপত্নীর মৃত্যুর পর আমাদের যৌথ জীবনযাত্রায় ছেদ পড়ে। আমার বন্ধুটি অন্যত্র চাকুরী লইয়া চলিয়া যান। আমিও অতঃপর সেখান হইতে চলিয়া আসি ও শ্রীযুক্ত কেশব সেনের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশ্যে যোগদান করি।

আমার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ব্যক্তিগতভাবে নিষ্ঠাবান পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে তেমন পীড়িত করে নাই। কিন্তু তিনি আমার বৃদ্ধ পিতামাতার কথা চিন্তা করিয়াই নিরতিশয় ব্যথিত হইতেন। ইহা আমি আমারই কোন এক বিশেষ পরিচিতের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সহিত আলাপ আলোচনায় এক দিনের জন্যও আমি তাঁহার কোন অসন্তোষ দেখি নাই। ব্যক্তিগতভাবে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভার এক সময় তিনি সেক্রেটারী ছিলেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে লিখিতেন। কিন্তু যুক্তির কথা বাদ দিয়াও সেই যুগে পুত্রের অন্যধর্ম্ম গ্রহণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ পিতামাতার অন্তরকে স্বাভাবিক ভাবে যে কতখানি ব্যথা দিতে পারে তাহা তিনি নিজের মধ্যে অনুভব না করিয়া পারেন নাই।

ধর্ম্ম সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের কোন গোঁড়ামি তো ছিলই না বরং তিনি এই বস্তুটিকে একেবারেই পছন্দ করিতেন না। আমার পিতৃদেবের সহিত সাক্ষাৎকালীন কথাবার্ত্তা হইতেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। আমার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষগ্রহণের অল্প কিছুকাল পরে পিতৃদেব মনোদুঃখে অবশিষ্ট জীবনযাপনের জন্য কাশীতে যান। কাশীবাসের প্রাক্কালে একবার তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। সেই সময় পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কাশীবাস করিয়া অধিক পুণ্য সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষাকে পণ্ডিতপ্রবর

গোঁড়ামির নামান্তর বলিয়াই মনে করিতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার পিতার সহিত সাক্ষাতের পরই তাঁহাকে বলেন,—আচ্ছা হারাণ, কাশীবাস তো আরম্ভ করলে কিন্তু গাঁজা সেবনের অভ্যাস করতে পারলে কি?

পিতা বিস্মিত হইয়া উত্তর দিলেন,—কাশীবাসের সহিত গাঁজা সেবনের কি সম্পর্ক?

বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলেলেন,—আরে, তুমি দেখছি আসল ব্যাপারটাই জান না। ধার্ম্মিকেরা বলেন, কাশীতে মৃত্যু হলে শিবত্ব প্রাপ্তি হয়, সেই শিবই তো গঞ্জিকা সেবনের জন্য বিখ্যাত। তুমি যদি এখন থেকে এবস্তু সেবনের অভ্যাস না কর, তাহলে মৃত্যুর পর কি দশা হবে?

উপরোক্ত কথাবার্ত্তা হইতে বুঝা যায় যে, পিতার এই গোঁড়ামি বিদ্যাসাগর মহাশয় সমর্থন করেন নাই। যাহা হউক, আমার ধর্ম্মান্তর গ্রহণকে পিতা কিন্তু ক্ষমা করিলেন না। সুতরাং স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে লইয়া আমি কলিকাতায় ভিন্ন বাসা করিতে বাধ্য হইলাম। সে সময়ে আমি নিজে ছাত্র, কাজেই ঠিক এই অবস্থায় সংসার প্রতিপালন যে কিরূপ কঠিন তাহা সহজেই অনুমেয়। এই দুর্দ্দিনে পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে যে সহায়তা ও সহানুভূতিলাভ করিয়াছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করা ধৃষ্টতা মাত্র। সর্ব্ব প্রকার বিপদে তিনি আমায় নিজ সন্তান জ্ঞানে আশ্রয় দান করেন।

দুঃখের ভিতর দিয়া দিন কাটিয়া যাইতেছিল। এমন সময় হঠাৎ একদিন দেখি, আমার গৃহে আমারই এক সতীর্থ অসুস্থ অবস্থায় তাহার স্ত্রী ও শিশু লইয়া উপস্থিত। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, বিধবা বিবাহ করার জন্য পিতা তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া সে আজ আমার শরণাপন্ন। আমার নিজের সংসার কে দেখে তাহারই ঠিক নাই, আমি আবার কাহার সাহায্য করিব? তাছাড়া, সেই বন্ধুটিকে আমি বিশেষ পছন্দও করিতাম না। কিন্তু এই দুর্দ্দিনে স্ত্রী-পুত্রসহ তাহাকে প্রত্যাখ্যানই বা করি কিরূপে? শুধু তাহাই নয়, উদ্যোক্তা হইয়া আমিই তাহার বিবাহ দিয়াছি। কোন প্রকারে সেই স্বল্প পরিসর গৃহে তাহাদের আশ্রয় দিয়া বন্ধুটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলাম।

রোগ কিন্তু ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই অবস্থায় একদিন বন্ধুটি তাহার পিতার সহিত তাহাদের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আমায় অনুরোধ করিতে থাকে। মুমূর্ষুর শেষ ইচ্ছা পূরণের কোন পথই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পিতা অমার অনুরোধ রক্ষা করিবেনই বা কেন? এসব ভাবিয়া বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। হঠাৎ মনে হইল, বন্ধুর পিতা তো এক সময় বিদ্যাসাগরের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাই একমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এই

সমস্যার সমাধান করিতে পারেন।

তাঁহার গৃহে অবিলম্বে উপস্থিত হইলাম। কিছু বলিবার পূর্ব্বেই আমার মুখের দিকে তাকাইয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—কি ব্যাপার? বল দেখি তোমার কি হয়েছে? তিনি যে আমার বন্ধুর পিতার নিকট পূর্ব্বেই এ সম্পর্কে শুনিয়াছিলেন তাহা জানিতাম না, সুতরাং সকল বিষয় জানাইলাম।

ব্যথিত হওয়ার পরিবর্ত্তে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—সেই দুশ্চরিত্র অবাধ্য ছেলেকে সাহায্য করবার কথা কে তোমায় বলেছে? তাকে তুমি বাড়িতেই বা কার হুকুমে স্থান দিয়েছ? এরূপ অবাধ্য যুবককে সাহায্য করার চেয়ে মেরে তাড়ানোই আমি উচিত মনে করি।

বড় আশা লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আসিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহার বাক্য শুনিয়া অকূল পাথারে পড়িলাম। হতাশ হইয়া নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিলাম। কয়েক মিনিট পর প্রণাম করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া শুধু বলিলাম,—বড় আশা করে আপনার কাছে এসেছিলাম যে মুমূর্ষুর শেষ ইচ্ছা হয়ত আপনার দয়ায় পূর্ণ করতে পারব। কিন্তু দুরদৃষ্ট, তা আর ঘটে উঠ্‌ল না।

একথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যেন হঠাৎ চমকিয়া উঠলেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিটি আমার প্রতি নিবদ্ধ করিয়া তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—দাঁড়াও যেওনা। তারপর আমাকে বেশ কিছুটা ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, আমার বন্ধুর পিতাকে তিনি আগামী কল্য আমার গৃহে লইয়া যাইবেন। কথামত কাজ করিতে তাঁহার ভুল হয় নাই।

পুত্রের রোগশয্যার পাশে পিতাকে বসাইয়া তিনি আমায় বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। তারপর আমার হাতে কিছু টাকা দিয়া বলিলেন,—দেখবে, তোমার বন্ধুর স্ত্রী-কন্যার যেন কোন রকম কষ্ট না হয়।

আমি অবাক হইয়া এই বিরাট পুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল, গতকল্যকার সেই সদাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সহিত আজিকার এই কোমলহৃদয় বৃদ্ধের যেন কোন সম্বন্ধই নাই। কাল যাহাকে সাহায্য করার জন্য আমাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, আজ তাহারই পরিবারবর্গের জন্য কি গভীর সমবেদনা। মন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

ইহার অল্প কিছুদিন পর অপর একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের আর একটি মহান দিক আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়। এই সময় তাঁহার মাতা পরলোক গমন করেন। মাতৃভক্ত পুত্রের সম্মুখে সমস্ত বিশ্বের অস্তিত্ব যেন বিলীন হইয়া যায়। তাঁহার মানসিক অবস্থা ক্রমে এমন দাঁড়ায় যে, তিনি কিছুদিনের জন্য কলিকাতার কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শহরতলী অঞ্চলে নির্জ্জনবাসের জন্য গমন করেন। শান্তি ভঙ্গ হইবে ভাবিয়া সে সময়ে সহসা

কেহই তাঁহার নিকট যাইতেন না। মায়ের সম্পর্কে সামান্যতম উল্লেখ শুনিলেও মাতৃশোকাতুর বৃদ্ধ বালকের মত অসহায় ভাবে ক্রন্দন করিতেন।

এ সময়ে দুইটি অবাঙ্গালী যুবক আমার নিকট উপস্থিত হয়, ছাত্র নিবাসে তাহারা ভর্ত্তি হইতে চাহিতেছে।

জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলাম, যুবক দুইটির দেশ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে। খৃষ্টধর্ম্ম সম্পর্কে কৌতূহলী হইয়া খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদের সহায়তায় দেশ হইতে তাহারা বোম্বাই-এ যায়। যাজকগণ প্রতিশ্রুতি দেন, যুবকদ্বয় খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে তাহাদের শিক্ষা ও কর্ম্মসংস্থানের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। কোন কারণে তাহাদের ধর্ম্মান্তরিত করায় বিলম্ব ঘটে ও কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষার্থ প্রেরিত হয়। সেখানে কয়েকটি ব্রাহ্ম ছাত্রের সহিত পরিচয় ঘটিলে তাহাদের নিকট হইতে কেশব সেন ও তাঁহার প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া উঠে। অতঃপর কেশব সেনের সহিত তাহারা সাক্ষাৎও করে। তিনিই যুবক দুইটিকে ছাত্রনিবাসে রাখিবার প্রস্তাব করেন।

কিন্তু সমস্যা দাঁড়ায় অর্থসংস্থান লইয়া। অভিভাবকের অমতে গৃহত্যাগের ফলে আত্মীয় স্বজন তাহাদের সাহায্য করিতে সম্মত নয়। ব্রাহ্মসমাজেরও সে সময় আর্থিক সাহায্য করিবার মত কোন সাচ্ছল্য নাই। সুতরাং হৃদয়বান ধনী ব্যক্তিদের অর্থ সাহায্য ব্যতীত এ শহরে তাহাদের চলিবার পথ কোথায়? সাহায্য লাভের জন্য যুবকদ্বয় তদানীন্তন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের স্বাক্ষরও সংগ্রহ করে। কিন্তু ভিক্ষামাত্রই অপরের অনুগ্রহাধীন ব্যাপার। প্রতিদিন তাহারা দ্বারে দ্বারে বিফল হইয়া ফিরিতে থাকে। এসময়ে হঠাৎ একদিন ইহাদের সহিত আমার পরিচয় ঘটে। বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা ইতিপূর্ব্বেই তাহারা শুনিয়াছে—আমার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার সংবাদও তাহাদের অজানা নয়। তাই পরিচয়ের পরই তাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত একটা যোগাযোগ ঘটাইয়া দিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিয়া বসে।

পণ্ডিত মহাশয় তখন নির্জ্জনে বাস করিতেছেন। এ সময়ে তাঁহাকে এই সকল বিষয় লইয়া বিরক্ত করিতে আমি সাহস করিলাম না। কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অপক্ষা করাও যুবক দুইটির পক্ষে সম্ভব নয়। আমার সাহায্য ছাড়াই তাহারা একদিন সাক্ষাৎ করিতে যায়।

এ সাক্ষাতের ফলাফল শীঘ্রই জানিতে পারিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে খুব মনোযোগ দিয়া তাহাদের সমস্যার কথা শুনিলেন। তারপর পরিষ্কাররূপে বলিলেন, পিতামাতার অবাধ্য সন্তানের জীবনে দুঃখ-দৈন্য অবশ্য প্রাপ্য, ইহার কোন প্রতিকার করিবার আগ্রহ তাঁহার নাই। কিন্তু কলিকাতার ধনী ব্যক্তিগণ শুধু স্বাক্ষর দিয়াই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন,

একথা শুনিবামাত্র তাঁহার মুখের ভাব মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই পাষাণ্ড মানুষের দলই পৃথিবীতে সুখ স্বাচ্ছন্দে বাস করে!" সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবেদন পত্রখানি লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। যুবক দুইটি তখন হতভম্ব হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

পণ্ডিত মহাশয় দৃঢ়স্বরে বলিয়া দিলেন, তাহারা যেন কখনও এই সব হীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারস্থ না হয়। যতদিন আত্মীয় স্বজনের সহিত কোন একটা মীমাংসা না হয় ততদিন তিনি মাসিক কুড়ি টাকা করিয়া তাহাদের দিবেন, এ প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়া দিলেন। তখনই আপিসের কর্ম্মাধ্যক্ষকে আদেশ দিলেন—যুবক দুটিকে ত্রিশটি টাকা দিয়ে দাও।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরীটি ছিল একটি দর্শনীয় বস্তু। বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে তিনি ইহার জন্য মূল্যবান গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে কর্ম্মব্যস্ত থাকার ফলে আমি প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতাম না, কিন্তু দেখা হইলেই আগ্রহ সহকারে তাঁহার পুস্তকাগারের কথা শুনিতাম। ইহা যেন তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ছিল।

শুধু সুপণ্ডিত রূপেই নয়, বিদ্যাসাগর সদাচারী ও সদালাপী বলিয়াও খ্যাত ছিলেন। অনায়াসে যে কোন ব্যক্তিরই হৃদয় জয় করিতে তাঁহার দেরী হইত না।

একবার আমার এক মাদ্রাজী বন্ধু সস্ত্রীক কলিকাতায় বেড়াইতে আসেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলন তখন একটি বহুবিতর্কিত বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কেন্দ্র করিয়া ইহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দেশ মধ্যে দুইটি দল সৃষ্টি না হইয়া পারে নাই।

আমার বন্ধু ও তাঁহার পত্নীটি এই নির্ভীক সমাজ সংস্কারককে দর্শন করিবার ইচ্ছা আমার নিকট প্রকাশ করেন। আমি তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে পেঁ'ছিলে তিনি আমার বন্ধু ও তাঁহার পত্নীকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। পরে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া বন্ধু-পত্নীকে একটি সুন্দর শাড়ীও উপহার দিয়াছিলেন। কয়েক দিন পরের কথা। গৃহের বাহিরে ঘোড়ার গাড়ী থামিবার শব্দ পাইয়া দরজা খুলিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। পণ্ডিত মহাশয় আমাদের বাড়ীর সম্মুখে গাড়ীটি রাখিয়া ত্রস্ত পদে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—কই হে, তোমার বন্ধুরা কই? আজই এক বিধবা বিবাহ হচ্ছে, এ অনুষ্ঠান দেখাবার জন্য আমি তাদের নিতে এসেছি।

অনুষ্ঠানটি হইতে ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুবর ও তাঁহার পত্নী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তাহাতে আমি আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়ি।

পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ দৃঢ় সূত্রে গ্রথিত ছিল। তাই সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও আবার তাঁহার নিকট ফিরিয়া না আসিয়া পারি নাই।

একদিন তাঁহার অধ্যয়ন কক্ষে বসিয়া আছি। তিনি কি একটি গ্রন্থ লইয়া গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেছেন। এমন সময় একটি খৃষ্টান বৃদ্ধা রমণী সেখানে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে একটি কাগজ পড়িতে দিল—সম্ভবতঃ উহা আর্থিক সাহায্যের জন্য এক আবেদন-পত্র।

পত্রখানি পাঠ করিয়াই তিনি বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বৃদ্ধার দিকে তাকাইয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন—"আমার কাছে আপনি শুধু শুধু কেন এসেছেন? আপনার স্বজাতির নিকট যান। আমাদের নিজের দেশেই এত দুঃখী রয়েছে যে তাদেরই সমুচিত সাহায্য দিয়ে উঠ্‌তে পারিনে। কিন্তু আপনি—"

হঠাৎ থামিয়া যাইতেই আমি তাঁহার দিকে তাকাইলাম। একদৃষ্টে তিনি বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া আছেন। তারপরই অকস্মাৎ ত্রস্তব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন,—আপনি এ অসুস্থ শরীর নিয়ে ওপরে উঠেছেন কেন? নীচে আমার দরওয়ানকে পত্রটি দিলেই তো পারতেন। আপনাকে কি একটু হাওয়া করতে বলবো?—

আগন্তুক নারী তখন হাঁপাইতেছে। তাহার চোখে মুখে রোগ যন্ত্রণার ছাপ। হাতের ইঙ্গিতে সে হাওয়া করিতে নিষেধ করিল। কোন প্রকার বাক্যব্যয় আর না করিয়া বিদ্যাসাগর বৃদ্ধাকে তৎক্ষণাৎ দশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

পণ্ডিত মহাশয় দানশীল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ—একথাই সকলে জানেন। কিন্তু এই বৃদ্ধটি যে আবার কিরূপ সংস্কারমুক্ত ও স্নেহশীল ছিলেন তাহার সংবাদটি হয়তো অনেকেই রাখেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক বন্ধু সে সময় তাঁহার ভগ্নীকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় লইয়া আসেন। এ তরুণীটির মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। ইহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয় শিশুকাল হইতেই আন্তরিক ভাবে স্নেহ করিতেন। কলিকাতায় আসার পর যুবতীটির ব্যাধির এক উপসর্গ পরিবারের সকলকেই বিব্রত করিয়া তোলে।

পণ্ডিত মহাশয় ভিন্ন অন্য সকলের সম্মুখে মেয়েটি আহার করা বন্ধ করিয়া দেয়। বৃদ্ধ প্রতিদিন দুইবার করিয়া সেখানে না গেলে এবং তাহাকে না খাওয়াইলে সে জলস্পর্শও করিবে না—ইহাই তাহার সংকল্প। কিন্তু আশ্চর্য্য স্নেহ ও মমত্ববোধ এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের! কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া তিনি নিয়মিতভাবে দুইবার করিয়া তাহাদের বাড়ী আসিতেন, শুধু এই অদ্ভুত রোগিনীটিকে খাওয়াইবার জন্য। তাঁহার বন্ধুটি তপশীল

শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, কিন্তু কোন বর্ণবৈষম্যবোধ এই সদাচারী ব্রাহ্মণের মনে ক্ষীণতম দ্বিধার সৃষ্টি করে নাই, বরং এ কার্য্যকে তিনি একটি বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়াই গণ্য করিতেন। দেখা যাইত, স্নেহশীল পিতার মতই তিনি প্রতিদিন আহার্য্যের পাত্র লইয়া রোগিনীর পার্শ্বে বসিয়া আছেন এবং নানা হাস্য পরিহাসের মধ্য দিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিতেছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে একদিন আমি তাঁহার বাড়ীতে যাই। আমার ন্যায় আরও কয়েকজন ব্যক্তিও সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া সেখানে উপস্থিত। আমরা বাড়ীর বাহিরের দালানে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছি এমন সময় পণ্ডিত মহাশয় হাসিতে হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিয়া গেলেন,—তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি আহার পর্ব্ব শেষ করে এখনি আসছি।

ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাদের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন এবং এমন গল্প আরম্ভ করিলেন যে, আমরা হাসিতে হাসিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে কিছু মুড়ি পাঠাইয়া দিবার জন্য নির্দ্দেশ করিলেন। যথাসময়ে মুড়ি আসিয়া পড়িল। প্রকাশ্য রাজপথের পাশে, বারান্দায় বসিয়া তিনি মহানন্দে আমাদের সহিত মুড়ি খাইতে আরম্ভ করিলেন, দৃশ্যটি সত্যই উপভোগ্য। তাঁহার মত পদস্থ ও সম্মানার্হ ব্যক্তি যে এরূপ সরল ও সহজভাবে রাস্তার ধারে বসিয়া মুড়ি চিবাইতে পারেন, এ ধারণা কাহারও ছিল না। সকলে মুড়ি খাইতেছি, এমন সময় আমার এক পরিচিত খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারক আমাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যে দাওয়ায় বসিয়া এই ভাবে মুড়ি চিবাইবেন ইহা তাঁহার কল্পনারও অতীত।

নিকটে আসিয়া এই পাদ্রীটি আমায় বলিতে লাগিলেন—আপনি আপনার ধর্ম্মজীবনে মুক্তির সম্পর্কে কি সত্যই কিছু কচ্ছেন? আমার তো মনে হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যে আপনি মুক্তিলাভ করতে পারবেন না।

তাঁহার এ ধরণের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় কৌতুকবোধ করিলেন। কিছুটা রসালাপ করিবার ইচ্ছায় তিনি অগ্রসর হইলেন!

পাদ্রী ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কখনও দেখেন নাই। পণ্ডিত মহাশয় একগাল হাসিয়া বলিলেন,—আরে মশাই, ওসব অল্পবয়স্ক যুবকদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করে কোন লাভ নেই। মুক্তির কথা চিন্তা করার ওদের অবসরই নেই। তার চেয়ে বরং আসুন আমরাই ধর্ম্মালোচনা করি—আমাদের তো ওপারের ডাক এসে গিয়েছে।

পাদ্রী এ কৌতুকের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না, খুব গম্ভীরভাবে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তিনি আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু ক্রমাগতই পরিহাসচ্ছলে নানারূপ কথা বলিতেছেন।

ইহার রসোপলব্ধি করা পাদ্রীর সাধ্য নয় বরং বিদ্যাসাগর যে ধর্ম্মকথা আলোচনা করিবার পাত্র নহেন ইহা ভাবিয়া তিনি রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। উত্তেজিত স্বরে তিনি বলিলেন,—বৃদ্ধ বয়সেও আপনি এমন নাস্তিক? মৃত্যুর পরে নরকেও আপনার স্থান হবে না। অতঃপর ক্রোধভরে পাদ্রী প্রস্থান করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় তখন উচ্চ হাস্যে ফাটিয়া পড়িলেন।

তারপর আমায় বলিলেন,—পাদ্রীটিকে কিন্তু আমার পরিচয় দিও না, তাহলে সে আরও দুঃখিত হবে। খৃষ্টান মিশনারী প্রচারকদের ধর্ম্মালোচনার কোন ক্ষেত্রবোধ নেই। তারা সব সময় মুক্তির গম্ভীর তত্ত্ব নিয়েই ব্যস্ত। এই কথাটি বুঝিয়ে দেবার জন্যই আমি তার সঙ্গে পরিহাস করছিলাম। কিন্তু মিশনারীদের কাছে রসিকতা যে এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ! তাই সে এমন রুষ্ট হয়ে উঠলো।

বিদ্যাসাগরের জীবনের আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমি আমার কাহিনী সমাপ্ত করিব।

আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতার বয়স তখন ষোল বৎসর। আমার কাছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নানা গল্প শুনিয়া তাঁহার সম্পর্কে হেমলতার একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ আকর্ষণ জন্মে। একদিন হেমলতার অনুরোধে তাহাকে লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলাম।

পথে হেমলতা হঠাৎ আমায় বলিয়া বসিল,—আচ্ছা বাবা! পণ্ডিত মশাই তো গোঁড়া হিন্দু। তিনি বিধবা বিবাহ পছন্দ করেন জানি, কিন্তু কুমারী মেয়ের বেশী বয়স অবধি বিবাহ না হওয়া পছন্দ করেন কি? তোমার মত পণ্ডিত মানুষ কন্যাকে এমন বেশী বয়স অবধি অবিবাহিত রেখেছেন, এতে তিনি তোমায় কিছু বলবেন না তো?

হাসিয়া বলিলাম,—পণ্ডিত মহাশয় সব কিছু কুসংস্কারেরই সংস্কারক, কাজেই তাঁর কাছে যেতে তোমার পিতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হবার কোন হেতু নেই, মা।

যথাসময়ে গাড়ী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহের বাহিরে আসিয়া থামিল। বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় আমার কন্যাকে পরম স্নেহে গ্রহণ করিলেন। নানা আলাপ আলোচনার পর আমি তাঁহাকে কন্যার আশঙ্কার কথাটি জানাইয়া দিলাম। শুনিয়া তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তারপর হেমলতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—কি গো, তুমি কি ভাবছ, বেশী বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেবার ব্যাপারে তোমার বাবাই শুধু বড় সংস্কারক ও বাহাদুর লোক। তুমি বুঝি জানো না যে, আমি আমার কন্যাদের বেশী বয়সে বিয়ে দিয়েছি। তাদের বিয়ের বয়স তোমার চেয়েও বেশী হয়েছিল।

ইহার পর হেমলতার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন,—'তাছাড়া,

তোমার চিন্তা কি? বাবা যদি বিয়ে স্থির না-ও করেন আমি তো একটি উপযুক্ত পাত্র উপস্থিতই রয়েছি। তুমি যেদিন বলবে সেদিনই তোমায় গিন্নী করে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসব।' তারপর সকৌতুকে হেমলতার চিবুক ধরিয়া বলিলেন—কি গো, বুড়ো বর পছন্দ হয়?

বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের এইরূপ রসালাপে আমরা সকলে তো হাসিয়া অস্থির।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পর্কে কিছু বলিতে আরম্ভ করিলে সত্যই আর তা শেষ করা যায় না। আমার সমগ্র চিত্তটি যেন তাঁহার স্মৃতিরসে মধুময় হইয়া রহিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের মানুষ—যাহারা এত বড় ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশেই এ মহান পুরুষের পবিত্র স্মৃতির কিছুটা প্রকাশ করিয়া আজ ধন্য হইলাম।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি অনুরাগের বীজ আমার কিশোর মনের কোমল ক্ষেত্রেই রোপিত হয়। কিন্তু কবে যে ইহার শুরু, সে কথা আমি নিজেই জানিনা। তবে জীবনের বহুতর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও আমার চিত্তে তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব একটি স্থায়ী আসন লাভ না করিয়া পারে নাই। তাঁহাকে মহর্ষি উপাধি দান সম্বন্ধে যখনই বিপক্ষের ব্যঙ্গোক্তি শুনি তখনই আমার পিতৃদেবের একটি উক্তি কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠে। এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে বাল্যকালে বলিতে শুনিতাম, "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহত্ত্ব ও অকৃত্রিম সততা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।" সেদিন এই বাক্যের অর্থ তেমন বুঝিতাম না, কিন্তু আমার শিশুমনে এই বাক্যগুলি যেন মন্ত্রের মতই গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল।

মহর্ষির প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আছে, আর সেই দাবীতেই আজ তাঁহার সম্পর্কে আমার স্মৃতি হইতে কয়েকটি অবিস্মরণীয় ঘটনা পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব ও নিজেকে ধন্য মনে করিব।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত কবে প্রথম পরিচিত হই তাহা সঠিক মনে নাই, তবে তাহা ১৮৬৫ কিম্বা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ হইবে বলিয়াই অনুমান হয়। সে সময়ে আমি ধর্ম্মান্দোলনের একজন উৎসাহী কর্ম্মী—ব্রাহ্ম সমাজেও নিয়মিত যাতায়ত করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কয়েকটি তরুণের নিকট হইতে মাঝে মাঝে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে অজস্র প্রশংসা শ্রবণ করিতাম। ফলে,তাঁহার প্রতি আমার আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং পরিচয় সাধনেরও ইচ্ছা জাগে।

আমি সে সময়ে ভবানীপুরে বাস করিতেছি। শুনিলাম, স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মহর্ষি নাকি প্রায়ই উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। একথা শোনার পর হইতে আমি নিয়মিত ভাবে ব্রাহ্মসমাজের সভায় যোগদান করিতে থাকি। প্রথম দিন তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠের বক্তৃতা ও দেবতুল্য মূর্ত্তি আমাকে মুগ্ধ করিয়া দেয়। খুব সম্ভব ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যখনই যেখানে তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছে আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া সাগ্রহে তাহা শ্রবণ করিয়াছি।

এ সময় একদিন আমি আমার ভ্রাতা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকে জানাই যে, ব্রাহ্মসমাজের দলভুক্ত হইয়া সমাজসেবার কাজ করিতে আমি ইচ্ছুক। আরও অনুরোধ করি যে, মহর্ষির সহিত তিনি যদি আমার সাক্ষাৎ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন তাহা হইলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। আমার ভ্রাতার সহিত

ব্রাহ্মসমাজের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাই অতি অল্প আয়াসেই আমার বহু দিনের এ ইচ্ছা পূরণের সুযোগ ঘটিল। একদিন তিনি নিজেই আমাকে লইয়া গিয়া মহর্ষির সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসিয়া আমার চিত্ত অপার আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

প্রথম যখন তাঁহার সহিত পরিচয় ঘটে তখন আমি মাত্র অষ্টাদশ কি ঊনবিংশ বৎসর বয়স্ক এক তরুণ। মহর্ষির উপস্থিতি আমার নিকট প্রতিভাত হয় যেন এক আবির্ভাব রূপে। স্তব্ধ বিস্ময়ে, সমস্ত অন্তর দিয়া এই বিরাট পুরুষকে সেদিন সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইয়াছিলাম। তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের একটি দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল, সর্ব্বদাই তাহা আমাকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত। আবার তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিরাটত্বই যেন তাঁহার সান্নিধ্যে যাইবার ইচ্ছাকে ব্যাহত না করিয়া পারিত না। এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মধ্য দিয়া আমার উন্মুখ চিত্ত তাঁহার প্রতিটি বাক্যকে মন্ত্রের ন্যায় অনুধাবন করিতে চাহিত।

সে সময়ে ব্রাহ্ম সমাজে এক বিচ্ছেদের অধ্যায় চলিতেছে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আদি ব্রাহ্মসমাজের একদল সদস্য মতানৈক্যের জন্য ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেনের নেতৃত্বে ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ নামক একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তখনকার মনোমালিন্য ও দলাদলি মহর্ষিকে মর্ম্মান্তিকভাবে আঘাত করে। তিনি ইহার পর হইতে অধিকাংশ সময়ই কলিকাতার বাহিরে পর্ব্বতাঞ্চলে বা নির্জ্জনস্থানে ধ্যানধারণা, অধ্যয়ন, আরাধনা ইত্যাদিতে অতিবাহিত করিতেন।

এই ঘটনার পর হইতে বাস্তবতঃ তাঁহার সহিত সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যায়, তিনি সব দায়িত্ব তাঁহার সন্তান ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর ন্যস্ত করেন। আমার সহিত মহর্ষির তখন সবেমাত্র পরিচয় হইয়াছে, তেমন কিছু ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের উপর তখনও আমার বিশ্বাস ও নির্ভরতা অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। ইহার একটি কারণও ছিল। আমার পিতৃপুরুষ ছিলেন শাক্ত এবং শৈশব হইতে শক্তি উপাসনা দেখিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমার কিছুটা অনাস্থা ছিল। এই সময় কেশবচন্দ্রের অধিনায়কত্বে নূতন ব্রাহ্মসমাজে খোল করতালসহ বৈষ্ণবদের মত কীর্ত্তনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে উহা আমি মনের দিক দিয়া সমর্থন করিতে পারি নাই। তাছাড়া, শ্রদ্ধেয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সমর্থন ও হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রভাবে এ মনোভাব আরও দৃঢ় না হইয়া পারে নাই।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আমার সতীর্থ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত আমি কয়েকবার নববিধান:সমাজের উপাসনা সভায় যোগদান করি এবং কেশব সেনের বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হই। তাহার পর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেনের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিতভাবে আমি ঐ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হই।

এই কয়েক বৎসরের মধ্যে মহর্ষির সহিত আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠে। তাঁহার অপূর্ব্ব উদারতা আমাকে বিস্মিত না করিয়া পারে নাই। আমি অপর সম্প্রদায়ভুক্ত একথা অবগত হইয়াও একদিনের জন্য তাঁহাকে এ সম্পর্কে কোন বিরুদ্ধ মত পোষণ বা বিরোধিতা করিতে দেখি নাই। আমি যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি তখনই আন্তরিক স্নেহ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। তাঁহার বাল্যস্মৃতি ও অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কে যে সকল কাহিনী আমি তাঁহার নিজ মুখ হইতে শুনিয়াছি তাহারই কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

বাল্যকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতামহীর নিকট প্রতিপালিত হন। এই বৃদ্ধা ছিলেন অতি ভক্তিমতী, হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতায় তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। বৃদ্ধার এই ভক্তিমত্তার প্রভাব বালক দেবেন্দ্রনাথকে সাকার দেবতায় বিশ্বাসী করিয়া তোলে। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের পথে ঠন্‌ঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম না করিয়া তাঁহাকে চলিতে দেখা যাইত না।

পিতামহীর স্নেহে পালিত কিশোর দেবেন্দ্রনাথের জীবন এভাবে বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় বোধহয় অন্যরূপ। তাই অকস্মাৎ একদিন একটি অতি সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার জীবনে এক নূতন পথের ইঙ্গিত আসিয়া পড়ে।

ঘটনাটি অতি সাধারণ। বহু মানুষের জীবনে অনুরূপ ঘটনা নিয়তই ঘটিতেছে। কিন্তু এক বিশেষ মুহূর্ত্তে—এই ঘটনাকে অনুসরণ করিয়াই দেবেন্দ্রনাথের জীবনে দেখা দিল এক বিরাট রূপান্তর।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে বালক দেবেন্দ্রনাথ একদিন নির্জ্জন ছাদে আকাশের দূর দিগন্তে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া বসিয়াছেন। বিরাট নভোমণ্ডলে খচিত অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ তাঁহার চিত্তে এক অপরূপ বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল। অকস্মাৎ বালকচিত্তে প্রশ্ন জাগিয়া উঠে, এই এতবড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি কি কখনও সীমাবদ্ধ হইতে পারেন? সেই সঙ্গেই চিত্ততল হইতে তখনই কে যেন বলিয়া উঠে—'সৃষ্ট জগৎকে অতিক্রম করেই তো স্রষ্টা বিরাজিত, সীমার মাঝে তাঁকে ধরা তো যায় না।'

এই বোধটি জাগ্রত হইবার পর হইতেই পৌত্তলিক ধর্ম্ম সম্পর্কে মহর্ষির বিশ্বাস কমিয়া যাইতে লাগিল। উল্লিখিত ঘটনার অল্পকাল পরে অপর একটি ঘটনা তাঁহার চিত্তে এই নবোপলব্ধ অনুভূতিকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধেয়া পিতামহীর মৃত্যু ঘটিল। আত্মীয় স্বজনের সহিত বালক শ্মশানে গমন করিলেন। তাঁহার জীবনে ইহা এক সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা।

বিত্তশালী ও প্রসিদ্ধ নাগরিক দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ সম্পদের

প্রাচুর্য্য, তোষামোদ, আরাম এবং আমোদ-আহ্লাদ প্রভৃতি বস্তুর সহিতই তিনি সদা পরিচিত। কিন্তু ইহা যেন তাঁহার জীবনের আহরিত সব কিছু অভিজ্ঞতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

বালক বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, আত্মীয় স্বজনেরা নগ্নপদে শ্মশানে বসিয়া আছেন। কেহ কেহ একপ্রান্তে বসিয়া উদাস ভাবে হুঁকা সেবন করিতেছেন। এ পরিবেশের সহিত তাঁহার কোন পরিচয় নাই। অকস্মাৎ এক মহাশূন্যতা তাঁহার সমগ্র চিত্তকে আবৃত করিয়া দিল। তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে দৃশ্যজগৎ অপসারিত হইয়া গেল, গভীর ধ্যানে তিনি মগ্ন হইয়া পড়িলেন। ঐ ধ্যানলোক হইতে উৎসারিত এক অপার্থিব আনন্দ তাঁহার দেহ মনকে সেদিন প্লাবিত করিয়া দেয়, সর্ব্বত্র ইহা প্রবাহিত হইতে থাকে।

এ পুরাতন কথাগুলি বর্ণনা করিবার সময়ে সেদিন যেন তিনি অপার্থিব আনন্দসাগরে অবগাহন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি তাঁহার স্মৃতি মন্থন করিয়া চলিলেন—আমিও তৃষিত চাতকের মত উন্মুখচিত্তে এই অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

পূর্ব্বোক্ত অপার্থিব আনন্দকে মহর্ষি মানস-আনন্দ বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলিয়া চলিলেন—বিশ্বপ্লাবী আনন্দ সাগর হইতেই জগৎ সৃষ্ট; তাহা হইতে জাত প্রবহমান সনাতন সত্যটি তাঁহার মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, স্রষ্টার স্বরূপ জাগতিক সব কিছুকে অতিক্রম করিয়াই পরিব্যাপ্ত। এ নূতন অনুভূতি ও সত্যোপলব্ধিই তাঁহার ভবিষ্যৎ সাধক-জীবনের ভিত্তিভূমি।

পিতামহীর মৃত্যুর শোক তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারিল না, এক অপূর্ব্ব আনন্দানুভূতিতে তাঁহার সমগ্র চিত্তটি পূর্ণ হইয়া রহিল। শবসৎকারান্তে সকলের সহিত বালক দেবেন্দ্রনাথ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু ইহার পর সমস্ত পারিপার্শ্ব ও ধন সম্পদের প্রতি তাঁহার এক নিরাসক্তি আসিয়া গেল। এই সময়ে নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দস্রোতের মধ্যে থাকিয়া বালক দেবেন্দ্রনাথ অন্ধকারে মাঝে মাঝে জ্যোতিদর্শন করিতেন।

কয়েকদিন এইরূপ আবিষ্ট অবস্থার মধ্যে অতিবাহিত হয়। ইহার পর অকস্মাৎ একদিন এই আনন্দস্রোত তাঁহার চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইল। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, এ অন্তর্দ্ধানের প্রকৃত কারণ তিনি বুঝেন নাই। যাহাই হউক, এই আনন্দ প্রবাহ রুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার চিত্তে যে বেদনা ও ব্যাকুলতা দেখা দিল তাহা অবর্ণনীয়। জীবনের সমস্ত আনন্দ, আকর্ষণও যেন তখন নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

প্রাতিদিনের নিয়মিত কর্ত্তব্যে দেখা দিল অবহেলা। বন্ধু-বান্ধবগণ বার বার আসিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া যায়, এক মর্ম্মান্তিক যাতনায় বালক রুদ্ধ কক্ষে

দিনের পর দিন স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকেন। নানা কর্ম্মে তাঁহার বিস্মৃতি আসে। আহারাদি করিবার পর মুহূর্ত্তেই তিনি সে কথা ভুলিয়া যান।

হতাশা ও ব্যকুলতার তাড়নায় একদিন তিনি বোটানিক্যাল গার্ডেনে নির্জন বাসের জন্য গমন করেন। যে আনন্দ লাভ করিয়া আঁধারের মধ্যে তিনি আলোক দেখিতেন, সে প্রবাহ এবার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যালোকেও চারিদিক যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইতে থাকে।

চরম ব্যর্থতা ও হতাশার মধ্য দিয়ে দেবেন্দ্রনাথের এক একটি দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। বোটানিক্যাল গার্ডেন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কয়েকদিন পর কিশোর দেবেন্দ্রনাথ একদিন চিন্তাকুল চিত্তে বারান্দায় পায়চারী করিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ দেখিলেন, পুরাতন গ্রন্থের একখানি ছিন্নপত্র বায়ুতাড়িত হইয়া তাঁহার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। কৌতূহলভরে তিনি ছিন্ন পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া দেখিলেন পত্রের বিষয়বস্তু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত না জানায় লিখিত অংশের অর্থ বুঝিলেন না। বাড়ীর অন্যান্য ব্যক্তিদের ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট যাইতে বলিলেন।

পরামর্শটি যুক্তিযুক্ত। দেবেন্দ্রনাথ আচার্য্যের নিকট গেলেন এবং জানিতে পারিলেন যে, ছিন্ন পত্রখানিতে ঈশোপনিষদের উদ্বোধন স্তোত্র লিখিত রহিয়াছে। স্তোত্রটির মর্ম্মার্থ হইতেছে, "এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণুপরমাণু হইতে যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুর মধ্যে বিশ্বনিয়ন্তা পরম ব্রহ্ম সূক্ষ্মভাবে বিরাজমান, সুতরাং জাগতিক বস্তুর বাহ্যিক আকর্ষণে মোহাবিষ্ট না হইয়া নির্লিপ্ত জীবনযাপন কর এবং সেই পরম ব্রহ্মের অনুসন্ধান কর, পরধন ভোগের লিপ্সা মনের মধ্যে রাখিও না।"

স্তোত্রের এই নিহিতার্থটি যেন দেবেন্দ্রনাথের নিকট এক দৈববাণী বিশেষ। দিবারাত্র তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইয়া ইহা তাঁহাকে আকুল করিয়া তোলে, ইহাই তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনার প্রকৃত সূচনা করিয়া দেয়।

মহর্ষি আমায় বলিয়াছিলেন, ঈশোপনিষদের এই মন্ত্রকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়াই তিনি অধ্যাত্ম-জীবনে প্রবেশ করেন। সমগ্র জীবনের সাধনায় এই সত্যটি উপলব্ধি করিবারই তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। বিশ্বের প্রতিটি অণুপরমাণুতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি এবং সমুদয় জাগতিক বস্তুতে নিরাসক্তির ভাব পোষণ, এই দুইটি সত্যকে আদর্শ করিয়াই তিনি সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এবং ইহাই তাঁহার অধ্যাত্ম-উপলব্ধির সহায়তা করিয়াছে।

নূতন জীবনের পথে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইবে—এ উদ্দেশ্যে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত করেন এবং পণ্ডিত রামচন্দ্র তর্কবাগীশের উদ্যোগে

ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই ধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিত ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

"পরধন আত্মসাৎ করিবার কোন বাসনা মনে স্থান দিও না।"--এই মন্ত্রটি মহর্ষির সাধন জীবনে যে কিরূপ প্রাণবন্ত হইয়া উঠে একটি দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় এক কোটি টাকা ঋণ রাখিয়া পিতা দ্বারকানাথ ইংলণ্ডে পরলোক গত হন। দেবেন্দ্রনাথ পিতৃদেবের ঋণের কথা জানিলেন এবং তৎসঙ্গে ইহাও জানিলেন যে, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে পিতা তাঁহার পরিবার প্রতিপালনের কথা চিন্তা করিয়া সম্পত্তির বৃহত্তর অংশটি ট্রাষ্ট-সম্পত্তি হিসাবে উইল করিয়া গিয়েছেন।

সমস্ত শুনিয়া তাঁহার মনে প্রশ্ন জাগিল--পিতৃঋণ পরিশোধের উপায় কি? এ ঋণ পরিশোধ না হইলে তো পিতার আত্মা শান্তি পাইবেন না? সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নও জাগিল যে, পরিবার প্রতিপালনের জন্য পিতা যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন বস্তুতঃ তাহা তো অপরেরই সম্পত্তি! পিতার পাওনাদারদের দাবী মিটাইয়া দিবার পর তবে তো ইহার উপর তাঁহার দাবী জন্মিবে?

ন্যায়তঃ কি করা কর্ত্তব্য এই চিন্তা এবার তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ঈশোপনিষদের সেই মন্ত্রটি সমগ্র চিত্তকে অনুরণিত করিয়া বারবার ধ্বনিত হইতে লাগিল --পরধন লিপ্সাকে অন্তরে স্থান দিও না।

একদিকে জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য, সমাজের প্রতিষ্ঠা, মান সম্মান, আর অপরদিকে পিতৃঋণ শোধের দায়িত্ব এবং সর্ব্বোপরি নিজ সত্যরক্ষার ব্যাকুলতা। এই দুই পরস্পর বিরোধী অবস্থার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের দিন কাটিতে থাকে। তিনি কিন্তু ভাল ভাবেই জানিতেন যে, পিতৃসম্পত্তি পাওনাদারদের হস্তে প্রত্যার্পণের পর সমস্ত পরিবারকেই চরম দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু ঈশোপনিষদের স্তোত্রটির অহরহ গুঞ্জন যেন তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। তাঁহার জীবনে সে এক সংকটময় পরিস্থিতি!

অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন। পিতার পাওনাদারদের দাবী আগে মিটাইবেন, সত্য হইতে তিনি কিছুতেই বিচ্যুত হইবেন না। দেবেন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইবার পর আত্মীয়েরা তাঁহাকে এই সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ জানাইতে থাকেন। ঠাকুরবাড়ীর প্রতিটি কক্ষেই এক আসন্ন অমঙ্গল চিন্তার ছায়া পড়িল। পিতৃব্য রমানাথ ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের এই আদর্শবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া বলিলেন, "সবই তো বুঝলুম, কিন্তু সমস্ত দেনা শোধ করবার পূর্ব্বে সংসার কিভাবে চলবে, তা চিন্তা করেছ কি? এতবড় সংসারের মান সম্মানই বা থাকবে কোথায়?"

দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে অবিচল রহিলেন। পিতার সমস্ত

কিছু স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি যথাযথ তালিকা তিনি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সকল আত্মীয় স্বজনই দেবেন্দ্রনাথের অপরিণামদর্শিতার কথা ভাবিয়া রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। সে সময় তাঁহার ভ্রাতাগণ কিন্তু জ্যেষ্ঠের সত্যনিষ্ঠার প্রতি সমর্থন জানাইতে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই।

সম্পত্তির তালিকা আদালতে উপস্থাপিত করিবার নির্দ্দিষ্ট দিনটি উপস্থিত হইল। প্রাতঃকালে আহারাদি পর ভ্রাতাগণসহ দেবেন্দ্রনাথ আদালতের উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। সে এক চাঞ্চল্যকর দৃশ্য!

পুরনারীদের উচ্চ ক্রন্দনে গৃহের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। উদ্‌ভ্রান্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয় শেষবারের মত ভ্রাতুষ্পুত্রকে সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। এবার তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "যাক্ এ বাড়ীর কোন ব্যাপারে আর আমি কিছু বোল্‌বোনা।" অতঃপর উত্তেজিত অবস্থায় সবেগে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সমগ্র বিরুদ্ধ পরিবেশটি দেবেন্দ্রনাথকে মর্ম্মান্তিক ভাবে পীড়িত করিতেছে। কিন্তু তিনি ইহাও জানেন যে, পিতৃঋণ পরিশোধ না করিলে তিনি সত্যভ্রষ্ট হইবেন। সুতরাং বাহির হইতে যত বিরুদ্ধতাই আসুক, আদর্শ তাঁহাকে রক্ষা করিতেই হইবে। অন্তরে শক্তি সঞ্চারের জন্য তিনি ব্যাকুলভাবে ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ঈশ্বরের অপার করুণা! দেবেন্দ্রনাথের বেদনাহত অন্তরে এক অদ্ভুত ঐশী শক্তি সঞ্চারিত হইল। সর্ব্ব সংশয় কাটিয়া গিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার সত্যদৃষ্টি উন্মুক্ত হইল—তিনি বুঝিলেন, সত্যপালন ভিন্ন জীবনের অপর কোন অর্থ নাই, মূল্যও নাই। শান্ত অবিচলিত চিত্তে তিনি সমগ্র সম্পত্তির তালিকাখানি বিচারকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন।

সত্যনিষ্ঠার এ প্রত্যক্ষ রূপ দেখিবার সৌভাগ্য ইতিপূর্ব্বে আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিদের জীবনে আসে নাই। তালিকাটি বিচারকের নিকট দিবামাত্র আদালত গৃহ যেন এক মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইয়া গেল। বিচারক স্বয়ং এবং পাওনাদারগণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে বিচারক প্রাপকগণের মতামত জানিতে চাহিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া একজন পাওনাদার সেদিন আদালত গৃহে ভাবাবেগে শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিলেন।

তাঁহার সেদিনকার সত্যনিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস প্রতিটি পাওনাদারকে এমন প্রভাবিত করে যে দ্বারকানাথের সম্পত্তি নীলামে উঠাইতে তাঁহারা অসম্মতি জানান। তাঁহারা বলেন যে, দেবেন্দ্রনাথ সুযোগ সুবিধামত কিছু কিছু করিয়া পিতৃঋণ শোধ করিলেই তাঁহারা খুশী হইবেন।

তিনি তাঁহাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং কয়েক বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় পিতৃঋণ শোধ করিতে সমর্থ হন। শুধু তাহাই নয় পিতা দ্বারকানাথ 'জেলা সাহায্য সমিতি'র প্রতিষ্ঠাদিবসে এক লক্ষ মুদ্রা দানের যে প্রতিশ্রুতি দেন দেবেন্দ্রনাথ তাহাও দান করিয়া পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। তিনি কেবল এই এক লক্ষ মুদ্রা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পিতার অর্থ দানের প্রতিশ্রুতির পর হইতে যতদিন বিলম্ব হয় সে সময়ের সুদ পর্য্যন্ত তিনি দিয়া দেন।

পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতি বলিতে গিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন পিতার ঋণশোধের কাহিনী আমার নিকট বিবৃত করিতেন তখন দেখিতাম—এক অপার্থিব, অনাবিল আনন্দে তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমি নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলাম যে, ঈশোপনিষদের মন্ত্র তাঁহার জীবনে চৈতন্যযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—অন্যথায় মানুষ এতখানি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইতে পারে না। স্তোত্রের অপর সূত্রের যথাযথ উপলব্ধি সম্পর্কেও তাঁহার নিকট হইতে নানা ঘটনা শুনিয়াছি এ সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরম কারুণিক ভগবৎ পিতার আবির্ভাব উপলব্ধি করা অধ্যাত্মসাধনার চরম কথা এবং ইহা উপলব্ধি করিতে হইলে প্রয়োজন একাগ্র ধ্যান-ধারণার।

মহর্ষি বস্তুজগৎ সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকিয়া সমগ্র জীবনেই ইহার অন্তর্নিহিত সত্তাটি উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে আড়ম্বরের কোন স্থানই ছিল না, একান্ত নীরবে ও নির্জ্জনে বাস করিতেই তিনি ভালবাসিতেন। অধিকাংশ সময়ই গহন অরণ্যে, পার্ব্বত্য অঞ্চলে, অথবা নদী বক্ষে বজরায় করিয়া এককালে তিনি দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করিতেন। এমন কি কলিকাতা নগরীর সর্ব্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ অঞ্চলে বাস করার কালেও তিনি প্রহরের পর প্রহর নিজ কক্ষে অধ্যয়নে অথবা ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। পাছে কেহ তাঁহার নীরব সাধনায় বিঘ্ন ঘটায় এজন্য তিনি তাঁহার অধ্যয়নকক্ষের সম্মুখে সর্ব্বদাই একজন প্রহরী মোতায়েন রাখিতেন। জনস্রোতের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার সমস্ত জীবন একটি নিরবচ্ছিন্ন মৌন সাধনায় মগ্ন হইয়া থাকিত এবং ইহারই মধ্য দিয়া তিনি পরম সত্যের অনুসন্ধান করিতেন।

দীর্ঘদিন মহর্ষির সঙ্গলাভের সৌভাগ্য আমার হয়। তাঁহার জীবনের প্রতিটি ঘটনা হইতে আমি ইহাই উপলব্ধি করি যে, বিপুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করিলেও ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান ও ব্রহ্মজ্ঞানই ছিল মহর্ষির জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র। এই তিনটি মন্ত্র তাঁহার সমগ্র জীবনের সহিত ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছিল। প্রতিটি আলোচনার মধ্যে তিনি এই মন্ত্রের পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া শ্রোতাদের নিকট ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেন। দৈনন্দিন জীবনের প্রতি কর্ম্মকে তিনি ব্রহ্মলাভের মানদণ্ডে বিচার করিয়াই গ্রহণ বা

ত্যাগ করিতেন। যে কোন কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে চিন্তা করিতেন, ইহা তাঁহার ব্রাহ্মলাভের সহায়ক, না পরিপন্থী। যে কর্ম্ম বা বস্তু হইতে তিনি অনাবিল আনন্দ পাইতেন তাহাকে ধর্ম্মপথের সহায়ক এবং যে কর্ম্ম তাঁহাকে এই আনন্দ হইতে বিচ্যুত করিত তাহাকে তিনি বিষবৎ মনে করিতেন।

তাঁহার নিকট হইতে ইহাও শ্রবণ করিয়াছি যে, ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদন করিতে হইলে চিত্তকে বস্তু-জগতের কোলাহল হইতে মুক্ত করিয়া শান্তি ও শুচিতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় এবং স্বীয় জীবনে তিনি এই সত্যটি পরম নিষ্ঠার সহিত পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ ও পালন করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র জীবনটি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অধ্যাত্মসাধনার চরম সত্যের উপলব্ধি ও ব্রহ্মলাভের পরিপূর্ণ প্রশান্তির জন্য একান্ত আকুলতা লইয়া তিনি সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।

মনের সত্যোপলব্ধির প্রকৃত পরীক্ষা হয় বিপর্য্যয়ের মধ্যে। সম্পদ বা সুখের আবর্ত্তে যাহা আচ্ছন্ন থাকে দুঃখ বা দুর্দ্দিনেই তাহা পরিপূর্ণরূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। সেজন্য দুঃখের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। সাধনলব্ধ সত্যবোধও যে মহর্ষির জীবনে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার জীবনের নানা সংকটে। সত্যবোধ ও সত্যদৃষ্টি তাঁহাকে চরম বিপর্যয়ের দিনেও মুহূর্ত্তের জন্য বিভ্রান্ত হইতে দেয় নাই। পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত বন্ধু বান্ধব এবং পরিবারের মতামতের বিরুদ্ধে উন্নতশিরে দাঁড়াইতে তাঁহার চিত্তে কোন সংশয়ই জাগে নাই।

মহর্ষি স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, অতি দুর্দ্দিনেও অন্তরস্থিত এক শক্তি যেন তাঁহাকে পথপ্রদর্শন করিয়া লইয়া যায় এবং প্রচ্ছন্ন এই পরম শক্তির উপস্থিতি তিনি সকল সময়ই অনুভব করেন। এই ঐশীশক্তিই তাঁহার সত্যধৃত চেতনাকে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

একবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পাঞ্জাবের অন্তর্গত মুরী পর্ব্বতে নির্জ্জন বাসের জন্য যান। বেশী সংখ্যক ভৃত্য বা সহচর লইলে সাধনায় বিঘ্ন হইবে এই আশংকায় তিনি মাত্র দুই তিনজন ভৃত্যসহ তথায় গমন করেন। তাহাদের প্রতি নির্দ্দেশ থাকে যে, প্রয়োজন বোধে আহ্বান না করিলে তাহারা যেন অকারণে তাঁহাকে বিরক্ত না করে। এই সময় তাঁহার প্রতিদিনের কর্ম্ম ছিল মুরী পর্ব্বতের অসমতল পথ বাহিয়া একাকী বহুদূর ভ্রমণ। তিনি প্রকৃতির অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যসম্ভারের মধ্যে পরম পিতার আবির্ভাব উপলব্ধি করিতেন। অধিকাংশ সময়েই শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ধ্যানেই ব্যয়িত হইত। এই একান্ত নিভৃতিময় জীবনে মহর্ষি পরমতত্ত্ব অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকিতেন।

এই সময় একদিন তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং দুই তিন দিনের মধ্যেই তাঁহার অবস্থা সংকটাপন্ন হইয়া উঠে। এই জনমানবহীন স্থানে উপযুক্ত

চিকিৎসা বা সাহায্যের কোন সুবিধা না থাকায় ভৃত্যেরা অতিশয় ভীত হইয়া পড়ে এবং পর্ব্বত পাদদেশে অবস্থিত শহর হইতে চিকিৎসক আনিতে ব্যস্ত হয়। মহর্ষি তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন—অকারণে কাহাকেও বিরক্ত করা উচিত নয়।

উপায়ান্তর না দেখিয়া ভৃত্যগণ অসহায়ভাবে চরম বিপর্য্যয়ের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। কয়েকদিন এই ভাবেই কাটে এবং এই সময়ের মধ্যে মহর্ষির অবস্থা আরও সংকটজনক হইয়া উঠে। তিনি নিজেও প্রতি মুহূর্ত্তে নির্লিপ্তভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহার এই সময়কার অনুভূতির যে বর্ণনা তিনি আমার নিকট দেন তাহা বড়ই বিচিত্র। তিনি বলেন যে, তিনি নিজেও তখন জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার জন্য কোন ব্যথা বোধ যেন নাই। এই সময়ে একদিনকার তীব্র শ্বাসকষ্ট এক অনাবিল অধ্যাত্মরস-সম্ভোগে রূপান্তরিত হইয়া যায় এবং তাঁহাকে দিব্য আনন্দাবেশে অভিভূত করিয়া ফেলে।

এই সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতে থাকে। মহর্ষি তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার উপর সমস্ত মনটি নিবিষ্ট করিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় উচ্চারণ করিতে থাকেন 'তুমি' এবং প্রতিটি শ্বাস গ্রহণের সময় কে যেন বলিতে থাকে 'আমি'। 'তুমি' ও 'আমি' এই দুইটি শব্দ শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সাথে ধ্বনিত হইয়া তাঁহার অন্তরে একটি ছন্দোবদ্ধ মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সমস্ত রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য আবেশের মধ্যে কাহার যেন কণ্ঠনিঃসৃত বাণী শুনিলেন—তোমায় এখনও বাঁচিতে হইবে, তোমার অনেক কর্ম্ম বাকী।'

এই ঘটনার পর তাঁহার ব্যাধি নিতান্ত অলৌকিক ভাবে সারিয়া যায়। ভৃত্যগণের সাহায্যে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া তিনি উপনিষদ্ হইতে কয়েকটি স্তোত্র বারবার পাঠ করিতে থাকেন। বিশ্বপিতার অপার করুণার স্পর্শে তাঁহার সমগ্র চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠে।

মহর্ষি বলিয়াছেন, অদৃশ্য শক্তি সম্পর্কে এই শ্রেণীর প্রত্যক্ষ অনুভূতির অভিজ্ঞতা তাঁহার জীবনে মাত্র আর একবার ঘটিয়াছিল। তখন তিনি চুঁচুড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। শরীরের অবস্থা খুবই শঙ্কাজনক, আমরা সকলে প্রতিদিনই মর্ম্মান্তিক সংবাদের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইয়া আছি।

চুঁচুড়ায় যাত্রার দিন কলিকাতার ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ মহর্ষিকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ইহার পর প্রতিদিনই কলিকাতা হইতে তাঁহার অনুরাগী ভক্তগণ তাঁহার শারীরিক অবস্থার সংবাদ লইবার জন্য চুঁচুড়ায় যাতায়াত করিতে থাকেন। রোগীর অবস্থা প্রতিদিনই অধিকতর সংকটজনক হইয়া দাঁড়ায়। একদিন সন্ধ্যায় ডাক্তার আশা ভরসা ত্যাগ

করিয়া বলিলেন—আজ রাত্রি কাটিবে না, ইহাই তাঁহার ধারণা।

মুমূর্ষুর শয্যাপ্রান্তে উদ্বিগ্ন বন্ধু, ভক্ত ও আত্মীয়স্বজন বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছেন। প্রতিটি মুহূর্ত্ত তাঁহাদের নিকট যেন এক একটি প্রহরের মত দীর্ঘ মনে হইতেছে। অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শয্যায় শায়িত, মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব প্রশান্তি।

এ সংকট কিন্তু তিনি এড়াইতে সক্ষম হন। আরোগ্যলাভের পর তিনি সকলকে বিস্মিত করিয়া দিয়া বলেন, রোগের ঘোরে আচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি এক অপার্থিব আনন্দ সম্ভোগ করিতেছিলেন। এই অবস্থার মধ্যে অকস্মাৎ যেন কোন এক অদৃশ্য শক্তি কয়েকটি অপূর্ব্ব স্তোত্র তাঁহার অন্তরে সঞ্চালিত করে ও রোগের সমস্ত যন্ত্রণা অপসৃত করিয়া দেয়। সেই কয়েকটি ছত্র তাঁহার সমস্ত দেহমনকে এক অনাস্বাদিতপূর্ব্বক অনুভূতির স্পর্শে ধন্য করে। অতঃপর সংকট অতিক্রম করিয়া তিনি সুস্থ হইয়া উঠেন।

মহর্ষির সাধনা এরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছিল যে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকিয়াও তাঁহার অধ্যাত্মরস সম্ভোগ বিঘ্নিত হয় নাই। অবশ্য তাঁহার জীবনের শেষভাগে দেখা যাইত, অধিকাংশ সময়েই তিনি ভাবাবস্থার মাঝে আত্মহারা হইয়া থাকিতেন। এ সম্পর্কে এক কাহিনী একবার শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণবাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম।

একবার কোন্নগরের বিশিষ্ট নাগরিক বাবু শিবচন্দ্র দেব স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতার ব্রাহ্মদের নিমন্ত্রণ করেন। আমিও সেবারকার উৎসবে উপস্থিত হই। এই অনুষ্ঠানে মহর্ষির সভাপতিত্ব করিবার কথা। নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার সময় আমরা সকলেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি এমন সময় তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর সহিত উপস্থিত হইয়া অনুষ্ঠানে যোগদান করিলেন।

অনুষ্ঠান ও প্রীতিভোজের পর দ্বিজেন্দ্রনাথ পিতাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রাজনারায়ণবাবুর সে রাত্রে কলিকাতা ফিরিবার ইচ্ছা নাই, অথচ মহর্ষিকে বলিতেও সাহস হইতেছে না। অবশেষে আমার কাণে চুপি চুপি বলিলেন, আমাকে মহর্ষির নিকট হইতে এজন্য অনুমতি করাইয়া লইতে হইবে। বলা মাত্রই তাঁহার সম্মতিটি মিলিয়া গেল। মহর্ষি সদলবলে চলিয়া যাইবার পর রাজনারায়ণবাবু তাঁহাদের কলিকাতা হইতে কোন্নগর আসিবার পথের নানা কাহিনী বলিতে শুরু করিলেন।

—নৌকাপথে কলিকাতা হইতে কোন্নগর আসিতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু মহর্ষি আমাদের লইয়া দুইদিন পূর্ব্বে নৌকায় করিয়া কোন্নগরের পথে যাত্রা করেন। যাত্রার পথে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মহর্ষি মাঝিকে কিনারায় নৌকা বাঁধিতে আদেশ করেন এবং তারপর বহু সময়

অতিবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু ভিতর হইতে নৌকা ভাসাইবার আদেশ আসিতেছে না দেখিয়া, আমরা মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিলাম।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মহর্ষি গভীর ধ্যানে মগ্ন। নেত্র নিমীলিত। মুখমণ্ডল এক অপার্থিব রসানুভূতিতে সমুজ্জ্বল। সমস্ত রাত্রি এভাবে গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক বাগানের সম্মুখেই অতিক্রান্ত হইল। পরবর্ত্তী দিবসও মহর্ষি সেই ধ্যানস্থ অবস্থাতেই কাটাইলেন, কেবল মাঝে মাঝে আমাদের সহিত সামান্য দুই একটি কথাবার্ত্তা বলিলেন। তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময়ও এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর দিবসান্তে আমরা কোন্নগরে পেঁ‍ৗছিলাম।

মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, মহর্ষির মত রসিক, বাক্‌পটু ব্যক্তি কোন্ অপার্থিব আনন্দ-লোকের সন্ধান পাইয়া একাধিক দিবস এরূপ মৌন অবস্থায় অতিবাহিত করেন?

মহর্ষি অধ্যাত্মরসে এরূপ মগ্ন হইয়া যাইতেন যে, সেসময়ে তাঁহার নিকট বিশ্বের অপর কোন বস্তুই অধিক প্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইত না। তাঁহার আবাল্য বন্ধুদের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, অধ্যাত্মজীবন শুরু হওয়ার পূর্ব্বে তিনি অধিক সময় বন্ধুবান্ধব লইয়া হাসিগল্পের মধ্যে অতিবাহিত করিতেন কিন্তু জীবনের নূতনতর অধ্যায় শুরু হইবার পর হইতে নির্জ্জনতাই পছন্দ করিতেন বেশী, এমন কি অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গও পরিহার করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না।

আমার নিজেরই এসম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। একবার কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের এক অধিবেশনে মহর্ষিকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়। আমি সেই সভায় বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। যথাসময়ে মহর্ষি নৌকাযোগে কোন্নগরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সভাশেষে আমি তাঁহার সহিত নৌকায় গমন করি। তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য একটি আকাঙ্ক্ষা শিশুকাল হইতেই আমার মনে বাসা বাঁধিয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনিও আমায় যথেষ্ট স্নেহ করিতেন তাহাও জানিতাম। কিন্তু নৌকায় আসিয়া তাঁহার যে পরিচয়টি পাইলাম, সে অভিজ্ঞতা আমার নিকট সম্পূর্ণ নূতন।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। স্থির গঙ্গাবক্ষে চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হইয়া এক স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মহর্ষির সহিত আমি বজরার ছাদে আসিয়া বসিলাম। ইচ্ছা—তাঁহার নিকট হইতে অধ্যাত্মসাধনার রহস্য বা তথ্যাদি কিছু শ্রবণ করিব। কিন্তু তাঁহার চিত্ত তখন নির্জ্জনতাপ্রয়াসী, চক্ষু দুটি নিমীলিত। আমার সহিত মাত্র দুই একটি কথা বলিয়াই তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন এবং আমায় নীচে যাইতে বলিলেন। বোধ হইতে লাগিল, সম্মুখে বসিয়াও তিনি যেন

বহুদূরে অবস্থান করিতেছেন। ধীরে ধীরে আমি বজরার ভিতরে ফিরিয়া আসিলাম।

আর একবার আমি ও আমার বন্ধু আনন্দমোহন বসু মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করি। মহর্ষি তখন শান্তিনিকেতনে নিভৃত জীবন যাপন করিতেছেন। রাত্রে আহারাদির পর আমরা তাঁহার নিকট কিছু শুনিব, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি কিন্তু সে কথার কোন গুরুত্ব না দিয়া বরং আমাদের শয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে নীচে নামিয়া আসিলাম ও দুই বন্ধুতে বহুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর শয়ন করিতে গেলাম।

যাইবার সময় লক্ষ্য করিলাম, মহর্ষি তাঁহার কক্ষসংলগ্ন বারান্দায় একাকী পদচারণা করিতেছেন। সেদিনও ছিল জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি। চন্দ্রালোকে সমস্ত প্রকৃতি যেন মায়ালোক সৃষ্টি করিতেছে। শয়নকক্ষের উন্মুক্ত গবাক্ষপথে মহর্ষির ভাববিভোর ভ্রাম্যমাণ মূর্ত্তিটি দেখা যাইতেছে। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানিনা। রাত্রি তিনটার সময় নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। আনন্দমোহন বসুকেও ডাকিয়া তুলিলাম। বিস্ময়ের সহিত উভয়ে লক্ষ্য করিলাম, মহর্ষি তখনও ঠিক একই ভাবে ধীরে ধীরে পায়চারি করিয়া চলিয়াছেন।

সংসারে সত্যের স্বরূপ সম্পর্কে আমরা নানা কথা শুনিয়া থাকি, কিন্তু সে সত্য সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা অতি অল্প ব্যক্তির জীবনেই লাভ হয়। তাছাড়া, এই ধারণা করিতে হইলে প্রয়োজন দীর্ঘ সাধনার। জ্ঞাত ও শ্রুত সত্যকে ধৃতিতে আনিবার জন্য মহর্ষি সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনা করিয়া গিয়াছেন— একাগ্র ধ্যান ও ধারণার ফলে উপনিষদের তত্ত্ব তাঁহার জীবনে চৈতন্যময় হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল।

একবার তিনি হিমালয় পর্ব্বতে নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছেন। আমি তখন সেখানে গমন করি। কথাপ্রসঙ্গে তিনি উপনিষদের একটি অতি পরিচিত স্তোত্র—ব্রহ্ম যেখানে সত্যম্ রূপে বর্ণিত, সেটি আমার সম্মুখে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। স্তোত্রটি আমি নিজেও বহুবার উচ্চারণ করিয়াছি, অন্যের নিকট হইতেও বহুবার শুনিয়াছি, কিন্তু মহর্ষির মুখনিঃসৃত স্তোত্র হইতে সেদিন যেন ইহার মর্ম্ম নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলাম। "বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম, সূত্রটি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখমণ্ডলে এক অপার্থিব উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠিল, মস্তকের কেশরাশি যেন এক অনির্ব্বচনীয় পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া চলিলেন, আর আমি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

অতঃপর আমার প্রতি চাহিয়া মহর্ষি প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন—আজ তোমার

সামনে যে কথাগুলি বলছি তা তুমি বহুবার শুনেছ, এমনকি নিজেও একাধিবার উচ্চারণ করেছ কিন্তু তুমি জানকি, এই সত্যের অন্তরালে কি গভীর সত্য নিহিত রয়েছে? আমার সমগ্র চিত্ত এই সত্যরসে মধুময় হয়ে উঠেছে।—সেদিন তাঁহার বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিলাম। মনে হইল, এতকাল শব্দ উচ্চারণই করিয়াছি মাত্র, ইহার নিহিতার্থ কোনদিন উপলব্ধি করি নাই।

একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পার্শী কবি হাফিজের লিখিত কবিতা পাঠ করিতে করিতে হঠাৎ ভাবস্থ হইয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—আমার নিজের মধ্যেই আমি হাফিজের উপস্থিতি অনুভব করছি, এক এক সময় আমার নিজেকেই হাফিজ বলে মনে হয়।—জীবনে তথ্য লইয়া আমাদের কাজ, ভাব-জীবনের খবর বড় একটা জানিতাম না। কিন্তু মহর্ষির উপলব্ধ সত্যের আলোয় নূতন করিয়া যেন ভাবজীবনের সন্ধান পাইলাম। নিজেকে ধন্য মনে হইল।

একদিন মহর্ষির সম্মুখেই আমি একটি আধ্যাত্মিক সত্যের ব্যাখ্যা করিতে থাকি। এই সময়ে আমার চিত্তটি অকস্মাৎ একটি রসঘন অনুভূতিতে স্থিতিলাভ করে। আমার এই বিশেষ উপলব্ধির ক্ষণটি মহর্ষির দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি তাঁহার আসন হইতে ভাবাবেগে উঠিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরেন। আর আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিতে থাকেন,—সত্যকে নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি না করলে কেউ এমন সুন্দর ভাবে তা প্রকাশ করতে পারে না। এমন করে যে তা প্রকাশ করতে পারে আমি তার অনুগত হয়ে জীবন উৎসর্গ করবো।

মহর্ষির এই মন্তব্যে নিজের উন্নতি সম্পর্কে সচেতন হইতে পারি নাই বরং তাঁহার সত্যপ্রীতি ও ভাবানুভূতির পরিচয় পাইয়া সেদিন অভিভূত হইয়া পড়িলাম। মনে মনে বলিলাম, অভিমান ও অহঙ্কারকে নিঃশেষে সত্যের পায়ে নিবেদন না করলে তো এরূপ নিরভিমান উক্তি উদ্‌গত হয় না!

মহর্ষির অধ্যাত্মসাধনা যে কত গভীরতা লাভ করিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমি পাইয়াছি তাঁহারই এক উক্তির মধ্য দিয়া। তাঁহার মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্বে আমি একদিন তাঁহার নিকটে বসিয়া আছি। হঠাৎ তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আমার অবস্থা কিরূপ জান? ঝাঁপিয়ে পড়েছি কূলহীন অনন্ত সমুদ্রে, কিন্তু তার কোন ঠিকানা এখনও পাই নি। অধ্যাত্ম-সাধনার ফলে যে নূতন সত্যের জগৎ আমার জীবনে নেমে এসেছে তাকে ব্যক্ত করবার মত ভাষা আমার জানা নেই। সে অনন্ত, অব্যক্ত।" তাঁহার এই উক্তি শুনিয়া বুঝিলাম তিনি অনন্ত আনন্দ-পথযাত্রী, আমাদের নমস্য।

মহর্ষি ধ্যান ধারণায় যেমন অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন, তেমনি আবার দৈনন্দিন আনুষ্ঠানিক কর্তব্য সম্পর্কেও তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল।

প্রত্যেক পরিবারে প্রতিদিন সম্মিলিত প্রর্থনা অনুষ্ঠানের জন্য সকল সময়েই তিনি গুরুত্ব আরোপ করিতেন। নিজেও তিনি ধ্যান ধারণা ব্যতীত প্রতিদিন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে বিশ্ব-পিতাকে স্মরণ ও প্রার্থনা করিয়া দিনের কর্ম্ম আরম্ভ করিতেন। বিশেষ অসুস্থতা অথবা অনুরূপ কারণ ব্যতীত এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে কেহ কোনদিন দেখে নাই। এমন কি মৃত্যু-শয্যায় শুইয়াও তিনি এ নিয়মটি যথাযথভাবে পালন করিয়া গিয়াছেন। শেষের দিকে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার স্বপ্নালোকে হঠাৎ তাঁহার মনে হয়, প্রাতঃকাল হইতেছে। শয্যায় শায়িত সাধক নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, ভোর হচ্ছে। তোমরা আমায় এ বন্ধ ঘর থেকে একটু বারান্দায় নিয়ে চল, আমি বিশ্বপিতার চরণে প্রণাম জানাই।

তিনি সকলকেই দৈনন্দিন পূজা ধ্যান করিবার উপদেশ দিতেন এবং ইহাও বলিতেন যে, গার্হস্থ্যজীবনে ধর্ম্মই বড় অবলম্বন, উহাকে ধরিয়াই সংসারের দুর্গম পথে যাত্রা করিতে হয়। তাঁহার নিজের অট্টালিকার পূজামণ্ডপে প্রতিদিন পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ সম্মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। এসম্পর্কে তিনি বড় সজাগ ছিলেন।

একদিন কথা প্রসঙ্গে মহর্ষি আমায় বলিতে লাগিলেন—দেখ শিবনাথ, তুমি যদি একটা কাজ করতে পার তাহলে আমি বড় খুশী হব। কাজ এমন কিছু দুরূহও নয়, কেবল নিয়মানুবর্ত্তিতার দরকার। তুমি যদি তোমার পরিবারে প্রতিদিন সমবেত প্রার্থনার ব্যবস্থা কর, তাহলে বড় কল্যাণকর হয়।

আমি উত্তর দিলাম—আমাদের নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পরিবার। সেখানে সকালে ও সন্ধ্যায় পরম পিতাকে স্মরণ ও তাঁর চরণে প্রণাম না জানিয়ে সংসারের কাজে রত থাকাকে পরিবারের সকলেই অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে করেন।

কথাটি শুনিয়া তিনি যেন আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলেন ও আমাকে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বলিলেন—শিবনাথ, তুমি আমায় সত্যি সত্যিই ভালবাস। তাই তুমি আমার ঈপ্সিত কর্ম্মকে আপনা থেকেই পালন কোর্‌ছ।

মহর্ষির প্রকৃত সাধক মনের পরিচয়টি পাইয়া বারবার তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম জানাইলাম। বুঝিলাম, তাঁহার সমস্ত অস্তিত্বই ঈশ্বরময় হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম তাঁহার জীবনে যেমন চৈতন্যযুক্ত হইয়াছে, তিনি নিজেও তেমনি অধ্যাত্ম-জগতের মাঝে এক স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন।

তাঁহার সত্তা ধর্ম্ম দ্বারা বিধৃত, ধর্ম্মরসে রসায়িত। ইহা ব্যক্ত করিবার মত ভাষা আমি জানি না, তবে এইটুকুই শুধু বুঝিয়াছি যে, ধর্ম্ম ও সাধন রহস্য লইয়া তিনি কেবল আলোচনাই করেন নাই, উহা উপলব্ধিও করিয়াছেন। সাধারণতঃ ধর্ম্ম ব্যতীত কোন কথাই তিনি বলিতেন না। তাঁহার নিকট

যাঁহারাই আসিতেন প্রত্যেককে তিনি বলিতেন—বেশী সময় সাধন ভজনে অতিবাহিত করতে যদি না-ও পার তবে তোমরা সন্ধ্যা-গায়ত্রীটা অবশ্যই কোরো।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দ অথবা তাহার কিছু পরের কথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন দার্জ্জিলিং-এ বাস করিতেছেন। কার্য্যোপলক্ষে আমি হঠাৎ সেখানে যাই ও তাঁহার নিকট উপস্থিত হই। কথাপ্রসঙ্গে নিত্যপূজা, উপাসনা ইত্যাদির কথা উঠিতেই মহর্ষি আমায় প্রশ্ন করিলেন—শিবনাথ, একটা কথা শুনে বড় বিস্মিত হলাম। অনেক ব্রাহ্ম আছেন, যাঁরা নাকি প্রতিদিন উপাসনা করেন না। কথাটা কি তোমার সত্য বলে মনে হয় ?

উত্তর দিলাম,—আপনি শুনে কিন্তু আরও বিস্মিত হবেন, সমাজভুক্ত এমন অনেক ব্রাহ্ম সদস্য আছেন যাঁরা ব্রহ্ম-আরাধনা করার প্রয়োজনই বোধ করেন না। এটা খুবই অবাঞ্ছিত ও নীতিবিরুদ্ধ তাতে সন্দেহ নেই। আরও দুঃখের বিষয়, এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে।

কথা কয়টি শুনিয়া মহর্ষি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ধর্ম্মহীন জীবন তাঁহার নিকট মৃত্যুরই নামান্তর। তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না যে, কোন ব্যক্তি ভগবানকে বাদ দিয়া আর সমস্ত কর্ম্ম করিয়া যাইবে। একটু স্তব্ধ থাকিয়া ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—আচ্ছা, তুমি বলতে পার, এ সব লোক নিজেদের ব্রাহ্ম বলে পরিচয় দেন কেন ? দেখ, যাঁরা শাক্ত তাঁরা সকলেই শক্তির আরাধনা করেন, তেমনি বৈষ্ণব, শৈব বা অন্যান্য পন্থীরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব আরাধ্য দেবতাকে স্মরণ মনন করেন, এর ভেতর দিয়েই ধর্ম্মের ধারাটিকে নিজের মধ্যে প্রবহমান রাখেন। তেমনি আমাদের সম্প্রদায়ের প্রকৃত কর্ত্তব্য হচ্ছে যে, এর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা ব্রহ্মের উপাসনা করবেন। কিন্তু এ'রা যদি কেউ ব্রহ্মোপাসনা না করেন তবে কিরূপে নিজেদের ব্রাহ্ম বলে পরিচয় দেন ? এযে সব দিক দিয়ে নীতি-বিগর্হিত। ধর্ম্মের গভীরতর দিক বাদ দিলেও, আনুষ্ঠানিক দিক থেকেও তো তাঁরা অপরাধী প্রতিপন্ন না হয়ে পারবেন না। কারণ সমাজের সদস্য হবার সময় নূতন সদস্যকে প্রতিজ্ঞা করতে হয় যে, তিনি আজীবন ব্রহ্ম-আরাধনা করবেন। এ প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তাঁর তো প্রতিদিনই প্রার্থনা করা উচিৎ।

মহর্ষি বলিয়া চলিলেন—এই আমার কথাই ধর না—১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সমাজের তৎকালীন আচার্য্য পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট ব্রহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি। সে সময়ে লিখিতভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, প্রতিদিন গায়ত্রীমন্ত্রসহ ব্রহ্ম আরাধনা করবো। এরপর থেকে আজ পর্য্যন্ত কোনো দিন আমি সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি। নেহাৎ কোন গুরুতর পীড়া ছাড়া অন্য কোন বাধাই আমাকে পরম-পুরুষের আরাধনা থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

প্রতিশ্রুত বাক্য যথাযথ পালন করে যাওয়া প্রত্যেক ব্রাহ্ম সদস্যেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইহার পর তিনি আমায় বলিলেন—দেখ তুমি যখন এখানে এসেছ আমার একটি কাজ করে দাও। আগামী সোমবার দার্জ্জিলিং ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, উপাসনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তুমি দার্জ্জিলিংয়ের প্রত্যেক ব্রাহ্ম সদস্যের পরিবারে নিয়মিত ভাবে ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করতে অনুরোধ জানাও।

মহর্ষির কথামত উপাসনা সভায় আমি তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিলাম। এ সময়ে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, একটি বৃদ্ধ মিশনারী ধর্ম্মযাজক আমার ধর্ম্মালোচনা লিখিয়া লইবার জন্য একটি যুবককে উপাসনা সভায় পাঠাইয়া দিয়াছেন।

দার্জ্জিলিংয়ে মহর্ষির সান্নিধ্যে আমি কয়েকদিন থাকিবার সুযোগ পাই। দেখিতাম, অতি প্রত্যুষে তিনি পর্ব্বতের জনহীন পথরেখা ধরিয়া একাকী ভ্রমণে বাহির হইতেন। প্রাতভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি কি করেন দেখিবার জন্য আমি কয়েকদিন তাঁহার অনুসরণ করি। বিজন প্রান্তরে আত্ম-সমাহিত সাধক কখনও ভাববিহ্বল অবস্থায় চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইতেন, কখনও বা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। অতঃপর বিশেষ একটি স্থানে উপবেশন করিয়া তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া যাইতেন। আত্মসমাহিত সাধকের মুখমণ্ডল তখন ব্রহ্মরস সম্ভোগের আনন্দে উদ্ভাসিত। উদার উন্মুক্ত আকাশের সহিত মহর্ষির একাত্মকতায় স্থানটি যেন তখন অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিত। সে সময়কার মনের অবস্থা বর্ণনা করিবার মত ভাষা আমার নাই।

মহর্ষির সাধনা কেবল মাত্র অধ্যাত্মপথ পরিক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ইহা তাঁহার সমগ্র জীবনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। জীবনের প্রতিটি ঘটনাকেই তিনি অধ্যাত্ম-আদর্শের মানদণ্ডে বিচার করিতেন, তারপর তাহা গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতেন। কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করিয়া তবে তাঁহাকে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে দেখা যাইত। অনুরোধে পড়িয়া বা অতর্কিতভাবে কখনই তিনি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না।

অবশ্য ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, তিনি কর্ম্মবিমুখ ছিলেন। একবার ব্রাহ্মসমাজের তিনটি বিভিন্ন শাখার বাৎসরিক সম্মিলিত উৎসব তাঁহার জোড়াসাঁকোর গৃহে অনুষ্ঠিত হইবার কথা হয়। সমাজের পক্ষ হইতে আমি তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব লইয়া যাই এবং তাঁহাকে উক্ত অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ জানাই।

এই সম্মিলিত প্রার্থনাসভার প্রস্তাবে আনন্দিত হইয়া তিনি কহিলেন,—আচ্ছা, আমায় এ সম্পর্কে চিন্তা করবার সময় দাও।

যে কোন উপস্থাপিত প্রস্তাব শুনিয়া তিনি প্রথমে এই কথাই বলিতেন এবং পরে সম্যকরূপে চিন্তা করিয়া নির্দ্ধারিত দিনে তাঁহার মতামত জানাইতেন।

বাৎসরিক উৎসব সম্পর্কে তাঁহার পরিজন ও ব্যক্তিগত পরিচারকদের নিকট হইতে পরে শুনিয়াছি যে, আমার সহিত উপরোক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে কথা বলিবার পরই তিনি ইহা লইয়া গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং অতঃপর পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজনদের একত্র করিয়া প্রত্যেককে ঐ উৎসবের অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ভার দেন। সকলেই যেন নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পর্কে অবহিত থাকে, ইহাও স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন।

নির্দ্ধারিত দিবসে মহর্ষির মতামত জানিতে আসিয়া আমি তাঁহার রচিত কর্ম্মসূচী শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার সানন্দ স্বীকৃতি পাইয়া সেদিন হৃষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসি।

প্রতিটি কর্ত্তব্য সম্পর্কেই এইরূপ সুশৃঙ্খল কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তিনি চলিতেন। তাঁহাকে কোন বিষয়ে একবার মতামত স্থির করিয়া উহা পরিবর্ত্তন করিতে কেহ কখনো দেখে নাই। অন্য কেহ কোন প্রকার অস্থির মতি প্রদর্শন করিলেও তাঁহার অসন্তোষের সীমা থাকিত না। এসম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিছু রহিয়াছে।

শান্তিনিকেতনের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইবার প্রায় এক মাস পূর্ব্বে আমাকে ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য তিনি পত্র দেন। পত্রোত্তরে আমি উক্ত অনুষ্ঠানে প্রাতঃকালীন প্রার্থনার পর ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিবার প্রতিশ্রুতি জানাই। কিন্তু তাঁহাকে ইহা জানাইবার পর আমার মনে হয় যে, বক্তৃতাটি সকালে না দিয়া সন্ধ্যায় দিলেই অধিক সংখ্যক শ্রোতা তাহা শুনিবার সুযোগ পাইবে—ভোর বেলায় অনেকেই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে সক্ষম হইবে না।

আমার পরিবর্ত্তিত সিদ্ধান্তটি কয়েকদিন পরে মহর্ষিকে জানাই। তিনি কিছুটা সময় নিমীলিত নেত্রে মৌনী হইয়া থাকেন। তারপর সহসা সবেগে মস্তক আন্দোলিত করিয়া আমার ঐ মত পরিবর্ত্তন অগ্রাহ্য করেন। তিনি বলেন, তখন আর পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত বদলানো সম্ভব নয়—সমস্ত কর্ম্মসূচী চূড়ান্তরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। তাহার ধরণ ধারণ আমি বিলক্ষণ জানিতাম। তাই এসম্বন্ধে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সিদ্ধান্তটি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়া লইলাম।

পরমব্রহ্মের স্মরণ মনন ও ধ্যান করিতে করিতে ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে মহর্ষির আসক্তি ও পক্ষপাতিত্ব অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। ফলে সাংসারিক বন্ধনের মধ্যে বাস করিয়াও নিরপেক্ষ বিচার করিতে তাঁহার ত্রুটি হইত না।

পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী দীর্ঘদিন তাঁহার পার্শ্বচর হিসাবে থাকার সৌভাগ্যলাভ করেন। তাঁহার নিকট হইতেই শুনিয়াছি—একবার মহর্ষির পরলোকগত ভ্রাতার বংশধরগণ ঠাকুরবাড়ীর যৌথ সম্পত্তির অংশ লইয়া একটি অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ইহার ফলে ভ্রাতুষ্পুত্রদের সহিত তাঁহার পুত্রদের মনোমালিন্যের উপক্রম হয়। সমস্ত বিষয়টি অবগত হইয়া তিনি দুই পক্ষকেই তাঁহার সম্মুখে আহ্বান করেন এবং অভিজ্ঞ আইনজ্ঞের পরামর্শ মত বিষয়টির মীমাংসা করিবার পরামর্শ দেন।

মহর্ষির সত্যনিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতা সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্রদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁহারা আইনজ্ঞ অপেক্ষা মহর্ষির পরামর্শকেই শ্রেয় জ্ঞান করিলেন, মনোমালিন্য মিটাইবার দায়িত্ব তাঁহার উপরই ন্যস্ত করিলেন। তাঁহার প্রতি ভ্রাতুষ্পুত্রদের নির্ভরতা আছে দেখিয়া তিনি বিষয়টি মীমাংসা করিয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এই ঘটনার পর দেবেন্দ্রনাথ উপর্যুপরি কয়েকদিন দীর্ঘ সময় প্রার্থনা ও ধ্যানে অতিবাহিত করেন। তারপর এইসঙ্গে তিনি জমিদারীসংক্রান্ত কাগজপত্র লইয়া নিবিষ্ট মনে সমগ্র বিষয়টি অনুধাবন করিতে থাকেন। যথাসময়ে পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে আহ্বান করিয়া তিনি স্বীয় সিদ্ধান্ত জানাইলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার মীমাংসা উভয়পক্ষে আশাতীত সন্তোষের সঞ্চার করে ও মনোমালিন্যের অবসান ঘটায়।

অধ্যাত্ম-অবগাহনের ফলে মহর্ষি এমনি প্রশান্তি লাভ করেন যে, খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন বুদ্ধির তরঙ্গ মুহূর্তের জন্যও তাঁহার চিত্তের পরম শান্তিকে কখনো বিঘ্নিত করিতে পারিত না। শুধু তাহাই নয় সমন্বয়ের সুরটি তাঁহার জীবনবীণায় যে অপরূপ ঝঙ্কার তুলিয়াছিল তাহার ফলেই তাঁহার অন্তরসত্তায় সৌন্দর্যবোধটিও এক বিস্ময়কর পরিণতি লাভ করে। তিনি ছিলেন কাব্য ও সৌন্দর্যের পূজারী। পারসী কবি হাফিজের প্রতি মহর্ষির শ্রদ্ধা ও অনুরাগ যে কত গভীর ছিল তাহার একটি উল্লেখ আমি ইতিপূর্বে এ প্রবন্ধেই করিয়াছি।

তিনি যে কেবলমাত্র কাব্য পাঠেই মগ্ন থাকিতেন তাহা নহে, প্রকৃত কাব্যরসিক ও কাব্যসমালোচকও তিনি ছিলেন। বিশেষ করিয়া কবিদের সম্পর্কে তাঁহার একটি স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতা লক্ষিত হইত। স্বীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার তিনি অনুরাগী ছিলেন এবং যাহাতে তাহাদের কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ হয় তৎপ্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতেও তাহার ভুল হইত না। নবীন কবিদের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য তিনি তাঁহাদের কবিতা প্রায়ই আমাদের সম্মুখে পাঠ করিতেন এবং সর্ব্বদা উপযুক্ত প্রশংসা করিতেও ছাড়িতেন না।

মহর্ষি যে কিরূপ উৎসাহী কাব্যানুরাগী ছিলেন দার্জিলিংয়ে থাকিবার সময় আমি তাহার কিছুটা পরিচয় লাভ করি। সে সময়ে একদিন তাঁহার নিকট কলিকাতার বাড়ী হইতে প্রকাশিত ভারতী মাসিক পত্রিকার একটি সংখ্যা আসে। সেই সংখ্যাটিতে তাঁহার এক কন্যার লিখিত একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। সংখ্যাটি পড়িতে পড়িতে লক্ষ্য করিলাম, কবিতাটির নীচে মহর্ষি পেন্সিল দিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন—তোমার কবিতা পাঠে যে কতদূর খুশী হয়েছি তা লিখে জানাতে পারিনে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তোমার লেখনীনৈপুণ্য দিন দিন পরিণতি লাভ করুক।

পত্রিকায় এজাতীয় মন্তব্য প্রকাশের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া মহর্ষিকে আমি এ সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তিনি উত্তর দিলেন,—এ সংখ্যাটি আমি কোল্‌কাতায় পাঠিয়ে দেব। আমার সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয় স্বজন আমার মতামত এর মারফৎ জানতে পারবে, সেজন্যই এতে আমার অভিমত লিখে রেখেছি।—এই ক্ষুদ্র মন্তব্যটি হইতে মহর্ষির গভীর কাব্যানুরাগের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলাম।

তখনকার সংরক্ষণশীল সমাজে মহিলাদের শিক্ষা, প্রগতি বা কাব্যানুশীলনকে এরূপ আন্তরিকতার সঙ্গে অনুমোদন ও উৎসাহ দান করিতে হইলে যথেষ্ট সত্যানুরাগ ও সৎসাহসের প্রয়োজন ছিল। অধ্যাত্ম-সাধক মহর্ষির জীবনের ব্যাপ্তিটি কিন্তু সাময়িকতার চিরন্তন সীমাকে অতিক্রম করিয়া সত্যের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। তাই অতি সহজে সত্যকে গ্রহণ করিতে তাঁহার অসুবিধা হইতে না।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে সে সময়ে কাব্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য চারুকলার অনুশীলনের একটি ধারা প্রবহমান ছিল। মহর্ষি স্বয়ং ছিলেন সেই ধারার প্রাণকেন্দ্র।

তিনি জানিতেন ও বিশ্বাস করিতেন—শিল্প, সঙ্গীত, কাব্য প্রভৃতির অনুশীলন ব্যতীত মানুষের মনের অন্তর্নিহিত সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত হইতে পারে না। মানুষের জীবনের পরিপূর্ণতা সাধনে, লোকোত্তর সত্তার উদ্বোধনে এই চারুশিল্পগুলি অপরিহার্য, ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। সেই জন্যই তাঁহার পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তি সে সময় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ ও আদর্শের অনুসরণে সচেতন ছিলেন।

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মহর্ষি সুন্দরের উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন। অতি সাধারণ ঘটনাকেও তিনি সুন্দর ও ছন্দোবদ্ধভাবে উপস্থাপন না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। গৃহে যখনই কোন উৎসব হইত, মণ্ডপ সজ্জা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিটি বিষয় তিনি নিজে দেখিতেন। কোন স্থানে কোন ত্রুটি বা

দৃষ্টিকটু কিছু থাকিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না।

মহর্ষির সাধকোচিত ভাবগাম্ভীর্য্যের মধ্যে একটি রসিক মনও বর্ত্তমান ছিল। তিনি ফুল অত্যন্ত ভালবাসিতেন—এজন্য সকল সময়েই তাঁহার কক্ষের ফুলদানী ভরিয়া গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল রাখা হইত। একবার কয়েকটি তরুণী মহর্ষিকে দর্শন করিবার জন্য আমার সাহায্য গ্রহণ করিতে আসে। আমি তাহাদের লইয়া মহর্ষির কক্ষে প্রবেশ করিতেই তিনি আমাদের সাদরে গ্রহণ করিলেন। তারপর ঈষৎ হাসিয়া কৌতুকভরে আমাকে বলিলেন—তুমি দেখছি পুষ্পদলে সজ্জিত হয়েই এসেছ! এদের সৌন্দর্য্যেই তো আমার কক্ষ শোভিত হয়ে উঠেছে।

তাঁহার জীবনদর্শনে সঙ্কীর্ণতার কোন ঠাঁই ছিল না। একবার গৃহে তাঁহার এক শ্যালিক বেড়াইতে আসেন, মহিলাটির অঙ্কন-বিদ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। মহর্ষি একদিন হঠাৎ তাঁহার অঙ্কিত একখানি চিত্র দেখিয়া ফেলেন। কলা বিদ্যার প্রতি শ্যালিকার এই অনুরাগের পরিচয় পাইয়া তিনি খুবই আনন্দিত হন ও তাঁহার চিত্রাঙ্কন শিক্ষার জন্য এক শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দেন। মহর্ষির এই আন্তরিক সহায়তায় মহিলাটি ভবিষ্যতে প্রথিতযশা শিল্পীরূপে গণ্য হন। যে কোন মানুষেরই সুপ্ত সুকুমারবৃত্তির উন্মেষ সাধনে তাঁহার আগ্রহের অন্ত ছিল না। সেজন্যই সে যুগে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী শিক্ষায়, শিল্পে,সঙ্গীতে আদর্শ স্থান অধিকারে সক্ষম হয়।

অধিকাংশ ব্যক্তিরই ধারণা সাধক দেবেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠেই সময় অতিবাহিত করিতেন। ইহা কিন্তু মোটেই সত্য নয়। যাঁহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করেন তাঁহারাই জানিতেন যে সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্ববিষয়ে মহর্ষির জ্ঞান কত গভীর ছিল। ধর্ম্মপুস্তক ব্যতীত অন্যবিষয়ক গ্রন্থ পাঠেও তাঁহার উৎসাহ কম ছিল না। কলিকাতার বাড়ীতে তাঁহার শয়নকক্ষটিই ছিল একটি গ্রন্থাগার বিশেষ। দেখিতাম, দার্জ্জিলিং-এর সেই নির্জ্জনবাসের মধ্যেও তিনি দেশ বিদেশের চিন্তা ও অগ্রগতির প্রতিটি সংবাদ রাখিতেন, এমন কি দৈনন্দিন জীবনসমস্যার কথাও জানিতেন এবং তাহার সমাধানের চেষ্টা করিতেন।

আমি ও আমার বন্ধু আনন্দমোহন বসু একবার শান্তিনিকেতনে মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই সে সময়ে তাঁহার বসিবার ঘরে টেবিলের উপর একখানি ভূতত্ত্ববিদ্যার বই দেখিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উহার দিকে তাকাই। মহর্ষি সহাস্যে বলিলেন—সংবাদপত্রে এ বইটির প্রশংসা দেখে এসম্পর্কে জানবার ইচ্ছে হয়, সেজন্যই এটা পড়তে আরম্ভ করেছি।

মহর্ষির বহুমুখী জ্ঞান সম্পর্কে আনন্দমোহনের তেমন কিছু ধারণা ছিল না। তিনি সাধক ব্যক্তি এবং নির্জ্জনের ধর্ম্মানুশীলন করেন, ইহাই শুধু তাঁহার জানা আছে। তাই কিছুটা বিস্মিত হইয়াই তিনি বলিলেন—এই নির্জ্জনবাসে

থেকে আপনি ভূতত্ত্ববিদ্যা পড়ছেন ?

মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন—কেন, ভূতত্ত্ব বিদ্যা কি পড়বার মত কিছু নয় ? এ যে এক বিরাট বিজ্ঞান। পর্বতে অবস্থানকালে দীর্ঘকাল আমি এ বিষয় নিয়ে বহু অধ্যয়ন করেছি।

প্রসঙ্গক্রমে মহর্ষি বলিলেন—মানুষের জীবনতরী দ্রুতবেগে জীবনের কূল থেকে মরণের পারে অগ্রসর হচ্ছে। এ স্বল্পসময়ের মধ্যে স্রষ্টার জগতের বিচিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় সেটুকু জেনে নেওয়াকে আমি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি। তাই আমার সমগ্র জীবনে আমি প্রকৃতির বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্য জানতে কোন দিনই পরাঙ্মুখ হইনি।

আনন্দমোহন বসু সেদিন মহর্ষির এই অসাধারণ জ্ঞানানুশীলনের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

মহর্ষির জ্ঞানান্বেষণের আরও একটি তথ্য জানিতে পারি কয়েকদিন পরে। সে সময়ে মিসেস হ্যাম্ফ্রেয়ার্ড সম্পাদিত "জার্ণাল অব অ্যামিয়েল" সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম পাঠক হইবার গৌরব আমি ছাড়িতে চাহি নাই। এই ইচ্ছা লইয়া তাড়াতাড়ি আমি পত্রিকাখানি জোগাড় করিয়া ফেলি ও মনে মনে একটি আত্মশ্লাঘা অনুভব করি। তাছাড়া, অভিলাষ ছিল যে, মহর্ষিকে একথা জানাইয়া চমৎকৃৎ করিয়া দিব।

কিন্তু আমাকে হতাশ হইতে হইল। সাক্ষাৎ হইবামাত্র মহর্ষি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন আমি "জার্ণাল অব অ্যামিয়েল" পড়িয়াছি কিনা। পড়িয়াছি শুনিয়া তিনি অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং গ্রন্থখানি হইতে কয়েকটি স্মরণীয় ছত্র আবৃত্তি করিয়া ফেলিলেন। বলা বাহুল্য, আমার দর্প একেবারে চূর্ণ হইল। মনে মনে ভাবিলাম, আমি যাহা পাঠ করিয়া অহংকারে স্ফীত হইয়াছি তাহা স্মৃতিতে এমন ভাবে ধারণ করিয়াও মহর্ষির কোন ভাববৈলক্ষণ্য ঘটে নাই!

তাঁহার গভীর জ্ঞানানুশীলনের আরও অনেক ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অধ্যাত্মসাধনার মধ্যে থাকিয়াও তিনি জগতের আধুনিকতম চিন্তাধারার সহিত কিরূপ যোগাযোগ রাখিতে পারিতেন, তাহা আমি বহুদিন চিন্তা করিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। দার্জ্জিলিংয়ে আমি একদিন তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আছি, হঠাৎ তিনি বলিলেন—তুমি গত মাসের টুয়েণ্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী পত্রিকায় প্রকাশিত টেনিসনের কবিতাটি পড়েছ ?

আমি লজ্জিত হইয়া অজ্ঞতা জানাইলে তিনি বলিলেন—অগ্রগামী জাতিগুলোর চিন্তাধার সাথে সবসময় যোগরক্ষার চেষ্টা করবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন ও বর্ত্তমান দর্শন সম্পর্কেও তাঁহার জ্ঞান ছিল সুগভীর। তাঁহার সমস্ত দর্শনের গ্রন্থগুলি তিনি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে

দান করিয়া যান। কাণ্ট, ফিক্‌টে ডেকার্ট, ভিক্টর কাজন্‌, হার্বার্ট স্পেন্সার, জে. এস. মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের গ্রন্থের পাতায় পাতায় তাঁহার লিখিত নোট দেখিয়া বোঝা যায়, প্রতিটি গ্রন্থই তিনি অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ না করিয়া ছাড়েন নাই।

এই অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা চিন্তা করিলে বিস্ময় বোধ হয়। আবার একথাও মনে হয় যে, তাঁহার মত উন্নতমনা ব্যক্তির পক্ষেই এজাতীয় জ্ঞানানুশীলন সম্ভব। সাধারণ মানুষের অধিকাংশ সময়ই স্বার্থসংঘাত, পক্ষপাতিত্ব, দলীয় মনোবৃত্তি প্রভৃতি সংকীর্ণতায় ব্যয়িত হয়। সৃষ্টির অসীম জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি দৃষ্টি দিবার সময় তাদের কোথায়? কিন্তু মহর্ষির সাধনলব্ধ সত্যের আলোক সম্পাতে সাংসারিক জীবনের সমস্ত সংকীর্ণতা বিরাটত্বে রূপায়িত হইয়া গিয়াছিল। সেই অধ্যাত্মশক্তি বলেই তিনি বৃহত্তর জীবনের বেদীতে সমাসীন হইয়া ঈপ্সিত পথরেখাটি ধরিয়া অগ্রসর হইতে সমর্থ হন।

মহর্ষির সমগ্র জীবনের সাধনা এমনই এক সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, জৈব জগতের ভেদ বুদ্ধি ও ক্ষুদ্রতা সেখানে ক্ষণেকের জন্যেও প্রবেশলাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। আমরা যখন দলীয় রাজনীতি হইয়া বিভ্রান্ত হইতাম বা দলাদলির মধ্যে মত্ত হইয়া পড়িতাম সেই সংকটময় মুহূর্ত্তেও দেখিয়াছি মহর্ষির মনের কোনখানে এ সংকীর্ণতার গ্লানি এতটুকু রেখাপাত করিতে পারে নাই। যাঁহারা তাঁহার ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই মহর্ষির চরিত্রের এই অসমান্যতার পরিচয় পাইয়াছেন।

মতভেদের জন্য আমরা তাঁহার সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া অন্য দলে যোগ দেই। কিন্তু ইহার জন্য কোনদিনও তাঁহার স্নেহলাভে বঞ্চিত হই নাই। তাঁহার কল্যাণকামী, স্নেহশীল মনটি দল ও পাত্র নির্বিশেষে সকলের সাহায্যার্থে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিত। মহর্ষির প্রবর্ত্তিত আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি প্রগতিশীল দল ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেনের নেতৃত্বে নূতন সমাজ গঠন করে। তিনি তখন মর্ম্মাহত হন সত্য, কিন্তু ক্ষণেকের জন্যও দলত্যাগীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন নাই। নবপ্রবর্ত্তিত দলের সভ্যেরা তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি সাগ্রহে তাঁহাদের অগ্রগতির পথে সর্ব্বরকমে সহায়তা করেন। ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে এরূপ মহৎ দৃষ্টান্ত আর দেখা গিয়েছে বলিয়া শুনি নাই।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেন ইংলণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহর্ষি তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জানাইলেন। শ্রদ্ধেয় কেশব সেনের সহিত তাঁহার মতান্তর ছিল সত্য, কিন্তু ইহা কখনো উভয়ের মনান্তর ঘটাইতে পারে নাই। আর একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এই যোগবন্ধনের

মূলে মহর্ষির অপরিসীম উদারতা। বৃদ্ধ সাধকের অমায়িকতায় অতীতের মতানৈক্যের সমস্ত তিক্ততা বিস্মৃতির অতলে চলিয়া গিয়াছিল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে নববিধান সমাজের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে কেশব সেন মহর্ষিকে উপাসনা সভায় পৌরোহিত্য করিতে আমন্ত্রণ জানান। মহর্ষিও সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করেন। তাঁহার উপাসনা সভার বক্তৃতা কিন্তু প্রগতিপন্থী দলের সন্তোষ বিধান করিতে পারে নাই বরং নববিধান সমাজের কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে উষ্মার সঞ্চার করে। প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহর্ষি বলেন যে, কেশব সেন প্রবর্ত্তিত নূতন সমাজ সনাতন পথ ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্যের ভাবধারার প্রতি অধিক আস্থাবান হইয়াছে। এই ভ্রান্ত মনোভঙ্গীকে তিনি 'খৃষ্ট বাতিক' নামে অভিহিত করেন।

আধ্যাত্ম-সাধনার ফলে মহর্ষির মন যে ভূমিতে উন্নীত হইয়াছিল। সেখানে কোন বিচ্ছিন্নতা, কোন দলগত ভেদ ছিল না। তাহা সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের পরম সত্য। সেকথা পরে বুঝিয়াছিলাম কিন্তু সেদিন মহর্ষির বক্তৃতা আমাকেও উত্তেজিত করিয়া তুলিল। ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেন মহর্ষির বক্তৃতায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন ও সমাজের পক্ষ হইতে আমাদের স্বাক্ষর-সমন্বিত একটি প্রতিবাদ পত্র তাহার নিকট প্রেরিত হয়। প্রকাশ্য উপাসনা সভায় একটি বিশেষ সম্প্রদায় সম্পর্কে এজাতীয় অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ যে, সর্ব্ব রকমেই গর্হিত, ইহাই ছিল পত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই পত্র প্রেরণের দুইতিন দিন পরে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মহর্ষির নিকট গমন করি। মহর্ষির মনে প্রতিবাদপত্রখানির কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছে, যাইবার সময় তাহাই চিন্তা করিতে ছিলাম। সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কিন্তু তাঁহার সস্নেহ অভ্যর্থনায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আলাপ অথবা ব্যবহারে কোন রকম তিক্ততার চিহ্নমাত্র নাই!

নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিবার পর প্রসঙ্গতঃ মহর্ষি বলিলেন—ভাল কথা, তোমরা আমার সেদিনকার বক্তৃতা সম্পর্কে যে প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছ তা দেখলাম। কিন্তু একটা কথা তোমাদের মনে রাখা উচিত ছিল, আমায় যখন বলবার দায়িত্ব দিয়েছ তখন আমি যা সত্য বলে বিশ্বাস করি তাই তোমাদের বলব। তোমরা ভবিষ্যতে আবার যদি আমাকে আমন্ত্রণ জানাও তাহ'লে আবার আমি এই কথাই বলবো যে, নববিধান সম্প্রদায় সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করে পাশ্চাত্য ধর্ম্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতে চলেছে—যাকে কোনমতেই আমি বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি না। এটাই তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ত্রুটি বলে আমার বিশ্বাস। আর একথাও তোমায় বলছি, স্বধর্ম্ম ত্যাগে কল্যাণ নেই, শান্তি নেই।

মহর্ষির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। সে মুখের কোনখানে কোন

অসরলতার ছাপ নাই বরং সত্য-প্রকাশের উজ্জ্বলতায় তাহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। উপলব্ধ সত্যকে যে এমন অকপটে ও সহজ সাবলীলতায় প্রকাশ করা যায় তাহা যেন সেইদিনই বুঝিতে পারিলাম। আমার মুখ দিয়া কোন প্রতিবাদ বাক্যই বাহির হইল না। চুপ করিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বলা বাহুল্য যে, এই ঘটনার পর ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেন মহর্ষির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য হইতে আরও সরিয়া আসিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথের সমালোচনায় সাময়িকভাবে তিনি মহর্ষির প্রতি রুষ্ট হইয়া পড়েন। ইতিমধ্যে সিঁদুরিয়াপটি ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানের সময় আসিয়া পড়িল। আয়োজনের দায়িত্ব সব আমার উপর। আমি মহর্ষিকে সান্ধ্য উপাসনায় বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ জানাইতেই তিনি অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া সম্মতি দিলেন। যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া তিনি আসন গ্রহণ করিলেন।

মহর্ষির পৌরোহিত্য করিবার খবর পাইয়া বহু শ্রোতা অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় কেশব সেনও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই পিছনের দিকের একটি চেয়ারে বসিয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিতে থাকেন। উপাসনা শেষে মহর্ষিকে তাঁহার গাড়িতে তুলিয়া দিবার জন্য আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হই।

পথের দুই পার্শ্বে অগণিত লোক মহর্ষিকে দর্শন করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। কেশব সেন সারিবদ্ধ জনতার পিছনে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছেন। আমি চলিতে চলিতে সেদিকে মহর্ষির দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেই বৃদ্ধ যেন ক্ষণেকের জন্য শিশুসুলভ চপলতায় অধীর হইয়া উঠিলেন। দ্রুতপদে কেশব সেনের নিকট গিয়া হাতটি দিয়া তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া অভিমানভরা কণ্ঠে বলিলেন—কেশব, তুমি এখানেই উপস্থিত ছিলে কিন্তু আমার পাশে এসে বসনি কেন? তোমাকে দেখলেই আমার মধ্যে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় উদ্দীপনা জাগে তা আমি বলতে পারি না। অনুষ্ঠানে এসে কোন পরিচিত মুখ না দেখে আমি তো বিব্রত বোধই কচ্ছিলাম। তুমি যদি আমার নিকটে থাকতে তা'লে আমি আজ আরও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিতে পারতাম।

বৃদ্ধের এই শিশুসুলভ সরলতা ও কেশব বাবুর প্রতি গভীর প্রেমের পরিচয় পাইয়া আমাদের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। কেশব বাবু নিজেও এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। সাম্প্রদায়িক মতভেদে সাময়িকভাবে তাঁহার মনে সংশয় জাগিলেও প্রবীণ সাধকের আন্তরিকতায় তাহা লঘু মেঘের মতই চিত্তাকাশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় কেশব সেনের সহিত বৃদ্ধের আন্তরিক যোগসূত্রটি অটুট থাকিয়া যায়। কেশব সেনের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে তিনি ছুটিয়া আসেন এবং মহাযাত্রার প্রাক্কালে তাঁহার উপর

শেষ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন। মহর্ষির বিরাটত্ব এমনি ভাবেই প্রত্যেককে স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিত।

তাঁহার আন্তরিকতা যে কত গভীর ও ব্যাপক ছিল তাহারই এক বিশেষ ঘটনা আজ আমার মনে পড়িতেছে। সে সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটি উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণের প্রস্তাব চলিতেছে। আমি সহরের বিভিন্ন স্থানে অর্থ সংগ্রহের জন্য ঘুরিতেছি। সমাজের কয়েকজন পদস্থ সভ্য মহর্ষির নিকট অর্থ সাহাযোয় জন্য একটি লিখিত আবেদন লইয়া গমন করেন। ইঁহাদের মধ্যে আমার বন্ধুবর আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন দাসও উপস্থিত ছিলেন।

কার্য্য শেষে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, লিখিত আবেদন পত্রটি পড়িয়া বার বার মহর্ষি আমার বন্ধুদের নিকট হইতে মন্দির সংক্রান্ত সকল তথ্য শুনিয়াছেন এবং জমির মূল্য, ট্রাষ্টি, ট্রাষ্টডীড্ প্রভৃতির বিষয় কি করা হইয়াছে তাহাও খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অর্থসাহায্য সম্পর্কে আমার বন্ধুরা যেন তেমন আশা পোষণ করিলেন না। আমি এ সম্পর্কে তাঁহাদের সহিত আর আলোচনা করিলাম না।

কয়েক দিন পরে এক সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হই। বসিবার কক্ষে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত তিনি তখন পার্শী কবি হাফিজ ও গুরু নানক সম্পর্কে নানা আলোচনা করিতেছিলেন।

এই সব অধ্যাত্ম-আলোচনা শেষ হইলে আমাদের নূতন মন্দির সংক্রান্ত বিষয়টি উত্থাপন করিলাম। তাঁহার মুখমণ্ডল একটি প্রশান্ত হাসিতে ভরিয়া উঠিল। অভিজ্ঞ আইনজ্ঞের ভঙ্গীতে তিনি বলিলেন—আবেদন যথাসময়েই পেশ করা হয়েছে, আর বিষয়টিও আজ অবধি বিবেচনাধীন রহিয়াছে।—কথাটি বলিয়া তিনি রাজনারায়ণ বাবুর সহিত পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এ সম্পর্কে তাঁহার প্রকৃত মনোভাব কিছু না জানায় মনে মনে বিব্রত বোধ করিতেছি; এমন সময় আলোচনার মধ্যেই তিনি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও আমার হাত দুটি ধরিয়া পাশের কক্ষে লইয়া গেলেন।

মহর্ষি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—দেখে মনে হচ্ছে, তোমার আহারাদি হয় নাই। প্রথমে সেটি শেষ কর, তারপর অন্য কথা। এই বলিয়া তিনি স্নেহশীলা মায়ের মত নিজ হস্তে পরিবেশন করিয়া আমায় আহার করাইলেন। আহারাদির শেষে বসিবার কক্ষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর আমি যাইতে উদ্যত হইলাম। তিনি বলিয়া উঠিলেন—তুমি তো বেশ লোক আবেদন সম্পর্কে রায় না শুনেই চলে যাচ্ছো!

রায় কথাটি শুনিয়াই ফিরিয়া তাকাইলাম। তিনি আমার হস্তে একখানি ৭,০০০ টাকার চেক দিলেন। তারপর বিচারের ভঙ্গীতেই ইংরাজীতে যাহা

বলিলেন তাঁহার মর্ম্মার্থ হইতেছে—তোমাদের মন্দির নির্ম্মাণে ইহা আমার সর্ত্তহীন উপহার।

সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় আমি ছিলাম সেই পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ। মহর্ষি সেই সময় আমায় একদিন ডাকিয়া পাঠাইলেন ও আমাদের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে জানিতে চাহিলেন। আমি তাঁহার জিজ্ঞাস্য সকল প্রশ্নের উত্তর দিলাম। সেদিন কিন্তু তাঁহার নিকট অর্থসংক্রান্ত কোন প্রস্তাব উত্থাপন করার কথাই চিন্তা করি নাই, তিনিই বরং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের কার্য্যের সংবাদ লইতেছিলেন।

হৃষ্টচিত্তে গমনোদ্যত হইতেছি এমন সময় মহর্ষি বলিলেন—থাম, কার্য্য পরিচালনা করতে তো অর্থের প্রয়োজন, কিছু নিয়ে যাও।—আমায় কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়েই তিনি বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ দিয়া দিলেন।

যাহারা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে অথবা যাহাদের মতবাদ সম্পর্কে তাঁহার আদৌ আস্থা নাই, তাহাদের কল্যাণের জন্যও এই বৃদ্ধের অন্তর সকল সময়েই সচেতন থাকিত। তাঁহার অপার স্নেহের কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না কিন্তু আমাদের সমস্ত অন্তর ইহার ধারায় প্লাবিত হইয়া যাইত।

মহর্ষির এই সদাজাগ্রত, স্নেহপ্রবণ মনের পশ্চাতে কিন্তু সাধক মনটি সদাই বিরাজমান ছিল। চরম বিপর্য্যয়ের সময়ও এই নিবাত নিষ্কম্প মনটির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যাইত। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর বিবৃত একটি ঘটনায় আমার এই নিজের ধারণা আরও দৃঢ় হয়।

প্রিয়নাথ বাবু বলিতেছিলেন—জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্র নাথের তখন কঠিন অসুখ। সে সময় তিনি চুঁচুড়ায় অবস্থান কচ্ছেন। স্নেহকাতর পিতা সকাল সন্ধ্যায় সন্তানের সংবাদ জানবার জন্য কলকাতায় লোক পাঠাচ্ছেন ও প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশাদি দিচ্ছেন। ঠিক যেদিন রাত্রে হেমেন্দ্রনাথ মারা যান, তার পরদিন সকালে যথারীতি আমি কলকাতায় এলাম তার সংবাদ নিতে। কিন্তু তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

—আমার অবস্থা চিন্তা করতে পারবেন না। ভাবতে লাগলাম এ সংবাদ মহর্ষিকে কি করে দেব? চুঁচুড়ায় ফিরে এসে নিজের কক্ষে বসে রইলাম। এদিকে সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে অথচ কলকাতা থেকেও কোন লোক এলো না। মহর্ষি চঞ্চল চরণে নিজের কক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কোন সংবাদ না পেয়ে তিনি মনে মনে যৎপরোনাস্তি চঞ্চল হলেন। কিন্তু আচরণে তেমন বেশী চাঞ্চল্য লক্ষিত হচ্ছিল না। সন্ধ্যাবেলায় যথারীতি বারান্দায় পদচারণা করতে করতে ভৃত্যদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি কলকাতা থেকে ফিরেছি কি না।

—আর বসে থাকা চলে না, সুতরাং ঘর হতে বার হয়ে মহর্ষির নিকট নত

মস্তকে দাঁড়ালাম। সংবাদ জেনে তিনি বোধ হয় এক মিনিট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন, তারপর বলে উঠলেন—ঈশ্বরের বিধান বিচিত্র! আমি এই বৃদ্ধ বয়সে পরপারে যাত্রা করবার জন্য বসে আছি আর আমার উপস্থিতিতে, সমস্ত দায়িত্ব আমার স্কন্ধে তুলে দিয়ে হেমেন্দ্র বিদায় নিয়ে গেল!—কথা কয়টি উচ্চারণ করেই তিনি আবার যথারীতি পদচারণা করতে লাগলেন যেন কিছুই ঘটেনি, এমন কি তাঁর চেহারায় শোক বা দুঃখের কোন ছায়া পর্য্যন্ত পড়ল না।

প্রিয়নাথবাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর পুনরায় শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া বলিলেন—গীতায় প্রকৃত ঋষির সংজ্ঞা বর্ণিত আছে—যিনি সুখে দুঃখে, হর্ষে বিষাদে অভিভূত হন না, ভয় বা ক্রোধ যাঁকে বিচলিত করতে পারে না এবং পার্থিব কোন বন্ধনই যাঁকে বাঁধতে পারে না—তিনিই মুক্তাত্মা, ঋষি। এরূপ যোগী বা ঋষির অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের কোনদিনই কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু সেদিনের এই মর্ম্মান্তিক পটভূমিকায় মহর্ষির যে শান্ত, সৌম্য, পাশবিমুক্ত মূর্ত্তি দেখলাম তাতে বুঝলাম তিনি প্রকৃতই মহর্ষি।

প্রিয়নাথবাবুর কথা শুনিতে শুনিতে আমারও মনের বিস্মৃতলোকের দ্বার উদঘাটিত হইয়া গেল। দীর্ঘ জীবনের ব্যবধানটি অতিক্রম করিয়া মনে পড়িল, মহর্ষি সম্পর্কে পিতৃদেবের সশ্রদ্ধ সেই মন্তব্যটি। কর্ণে কেবলই ধ্বনিত হইতে লাগিল—দেবেন্দ্রনাথ সত্যই মহর্ষি, পৃথিবীতে এমন চরিত্র বড় বেশী দেখা যায় না। অপার্থিব আনন্দে আমার সমস্ত মন প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

রাজনারায়ণ বসু

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমকালীন যে সব প্রতিভাধর ব্যক্তি বাঙ্গালী সমাজে স্থান, ত্যাগ ও স্বাদেশিকতা দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রেই স্মৃতিপথে উদিত হয়। তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়ের সন বা তারিখ সঠিক স্মরণ নাই, তবে তাহা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বলিয়াই বিশ্বাস।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় স্বাদেশিকতা লইয়া বাংলার জনসমাজে এক প্রবল আন্দোলন চলিতেছে। শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র তখন 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রিকার সম্পাদক। দেশীয় সংস্কৃতির ধারা দেশের মধ্যে অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে ১৮৬৭ সালে তিনি একটি স্বদেশী মেলার ব্যবস্থা করেন। এই মেলায় দেশীয় শিল্প, ভাস্কর্য্য, কৃষি ইত্যাদির প্রদর্শনী ও বাংলার লোকসাহিত্য, পাঁচালি, কবি গান, তর্জ্জা প্রভৃতিরও আয়োজন করা হয়। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইবার স্থায়ী বন্দোবস্ত নবগোপাল বাবু করেন। প্রথম বৎসরেই এই মেলার উদ্দেশ্য আশাতীতভাবে সফল হয়, বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে ইহাতে বহু গুণী, জ্ঞানী ব্যক্তির সমাগম ঘটে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মেলাতে আমি উপস্থিত হই।

মেলায় যোগ দিবার কিছু দিন পূর্ব্বেই রাজনারায়ণ বাবুর সহিত আমার পরিচয় ঘটে। এরূপ স্বদেশী ভাবাপন্ন মানুষ আমি ইতিপূর্ব্বে বেশী দেখি নাই। নবগোপাল বাবুর স্বদেশী মেলায় তাঁহার আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। আমার সহিত পরিচয় হইবার কয়েকদিন পরই তিনি মেলার কথা আমায় বলিলেন। তা ছাড়া, সে সময়ে যে সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করিবার জন্যও তিনি উৎসাহিত করেন। তাঁহার নিকট হইতেই বাঙ্গালী রাজা বিজয় সিংহের সিংহল বিজয়ের কাহিনীটিও প্রাপ্ত হই ; এই বাঙ্গালী বীরের কাহিনী বলিতে বলিতে গর্ব্বে তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

নবগোপাল মিত্র মহাশয় রাজনারায়ণ বাবুর নিকট হইতেই তাঁহার স্বদেশী মেলা প্রবর্ত্তনের প্রেরণা লাভ করেন। মেদিনীপুরের জনসাধারণের চিত্তে স্বাদেশিকতা বোধ জাগাইবার জন্য তিনি যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন, তাহা পাঠ করিয়াই নবগোপাল বাবু স্বদেশীব্রতের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। অতঃপর জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও আত্মবিশ্বাস উদ্দীপিত করার জন্য তিনি স্বদেশী মেলার প্রবর্ত্তন করেন।

রাজনারায়ণ বাবুর সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই আমি

তাঁহার একজন গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলাম। ১৮৬৫ সালে প্রদত্ত তাঁহার মেদিনীপুরের বক্তৃতা সে সময়ে ছাত্র সমাজে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে—এখন হয়ত অনেকেই উহার প্রভাবের কথা অবগত নহেন। সে সময়ে তাঁহার এই সব বক্তৃতা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরেও পঠিত হইত

সাহিত্যিক প্রতিভায় প্রদীপ্ত, আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসুর রচনাগুলি কেশব সেনের মত প্রতিভাধর বাগ্মীকেও অনুপ্রাণিত না করিয়া পারে নাই।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মক্ষেত্র মেদিনীপুর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। বরাবরই তাঁহার প্রতি আমার এক গভীর অনুরাগ ছিল—সুতরাং এ মহাত্মা কলিকাতা আসিবার পরই আমি যেন চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের মত তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলাম। প্রতিদিনের দর্শনার্থী-রূপে আমার আনাগোনা শুরু হইল। কোন মানুষের মধ্যে যে একাধারে এরূপ বিনয়, দয়া, কমনীয়তা ও আন্তরিকতা থাকিতে পারে, পূর্ব্বে তাহা আমার ধারণা ছিল না। তাঁহার আচরণে বা কথায় আমার মত বিরুদ্ধদলভুক্ত ব্যক্তির প্রতি বিন্দুমাত্র উষ্মার আভাষ পাইলাম না। উদার, সংস্কারমুক্ত এই বিরাট মনের স্পর্শে সেদিন ধন্য হইলাম—বুঝিলাম, কোন প্রকার দলীয় বিরোধ এই মহান পুরুষের ব্যক্তিত্বের উপর সঙ্কীর্ণতার কোন রেখাপাতই করিতে পারে নাই।

ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁহার সহিত বহু ক্ষেত্রে আমার মতের অমিল ছিল, কিন্তু এই বৃদ্ধের বিরাট ব্যক্তিত্ব আমার চিত্তটি জয় করিয়া লয়। আমাদের মতের অমিলকে বড় করিয়া তুলিয়া তিনি কখনো মনের মিলের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার দীর্ঘ জীবনের বহু চিত্তাকর্ষক অভিজ্ঞতা তিনি আমায় বলিতেন। পরিচয়ের পর হইতে যতই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়াছি, তাঁহার অপূর্ব্ব চরিত্রের পরিপূর্ণ রূপ আমায় ততই বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছে। বহু বড় বড় প্রতিভাকে তাঁহার নিকট আসিতে দেখিয়াছি এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁহার শিশুসুলভ সরলতা ও চরিত্রের শুচিতার বহু নিদর্শন পাইয়াছি।

তাঁহার একটি সম্পদ ছিল বড় আকর্ষণীয়—তাহা তাঁহার হাসি। এমন প্রাণমাতানো হাসি জীবনে আর দেখি নাই। তাঁহার হাসি সম্পর্কে একটি মজার গল্প আছে—

আমি তখন হেয়ার স্কুলে সংস্কৃতের শিক্ষক। নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে আদর্শ শিক্ষক রূপে খ্যাত। আমরা মনে-প্রাণে তাঁহার আদর্শ ও শিক্ষকতাকে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে সচেষ্ট।

হঠাৎ একদিন কথা প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর কথা উঠে। বৃদ্ধ

নীলমণিবাবু দুই হাত জোড় করিয়া মাথায় হাত ঠেকাইয়া বলিলেন—রাজনারায়ণবাবুর কথা বলছেন? তিনি মানুষ ন'ন—সাক্ষাৎ দেবতা।

নিষ্ঠাবান, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নীলমণিবাবু খুব রক্ষণশীল ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত রাজনারায়ণবাবু সম্পর্কে তিনি এরূপ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করাতে আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—আপনি যাঁর সম্বন্ধে এরূপ উচ্চ প্রশংসা কচ্ছেন তিনি তো স্বধর্ম্মত্যাগী, তা কি আপনি জানেন না?

নীলমণিবাবু সজোরে মস্তক নাড়িয়া বলিলেন—তিনি কোন্ সমাজের বা কোন্ ধর্ম্মের তা জানবার আমার দরকার নেই, কিন্তু মানুষ হিসাবে তাঁর তুলনা হয় না। আমার জীবনে তো, বাবা, আমি এমন মানুষ বড় বেশী দেখিনি।

—আপনি তাঁর ভেতর কী দেখেছেন?

নীলমণিবাবু বলিলেন—দেখ বাবা, দিব্যালোকের মানুষ না হলে কি কেউ অমন প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে! তাঁর হাসিটিই যে মানুষের মনের সংকীর্ণতা দূর করে, তাকে উঁচুতে তুলে দেয়। তা হলে শোন, একদিনের ঘটনা তোমায় আমি বলি—

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ সুহৃদ পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সুকিয়া ষ্ট্রীটে থাকতেন। একদিন আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখি রাজনারায়ণবাবু একটি আরাম কেদারায় শুয়ে সংবাদপত্র পাঠ করছেন। আমি যেতেই রাজকৃষ্ণবাবু আমার সাথে আলাপ শুরু করে দিলেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন, দেয়ালের গায়ে একটি টিক্‌টিকি একটি মাকড়শার পেছনে ছুটে তাকে ধরে ফেললো।

রাজকৃষ্ণবাবু চিৎকার করিয়া উঠিলেন—রাজনারায়ণবাবু, দেখুন কাণ্ডখানা? আপনি ঈশ্বরের দয়ার কথা এত বলেন, কিন্তু এই টিক্‌টিকিটা যে বেচারি মাকড়শাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলো, এর মধ্যে কোন্ দয়ার চিহ্ন দেখ্‌লেন?

রাজকৃষ্ণবাবুর কথা শুনিয়া রাজনারায়ণবাবু উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তারপর বলিলেন—বেচারী ভগবান! তিনি যে সত্যই ভাল এটা সংশয়ী ব্যক্তিদের কাছে প্রমাণ করার জন্যে উপযুক্ত যুক্তিতর্ক না রেখে খুবই ভুল করেছেন। কিন্তু হাজার হাজার টিক্‌টিকি যদি হাজার হাজার মাকড়শাও ভক্ষন করে তা হলেও আমি বলবো, ঈশ্বর দয়ালু।

একথা বলার পর রাজনারায়ণবাবুর মুখে অপূর্ব্ব হাসির ঝলক খেলে গেল। সে হাসির মধ্যে আমি যেন এক অনাবিল স্বর্গীয় আনন্দের আভাস পেলাম। বহুদিন চলে গিয়েছে কিন্তু তাঁর সেই হাসি আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। মানুষ কখনো এমন হাসি হাসতে পারে না। সত্যই

তিনি দেবতা।

নীলমণিবাবু আবার যুক্তহস্তে তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার জানাইলেন। এই ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সংস্কারের ঊর্দ্ধে যে মনটি বর্ত্তমান সেই মন দিয়াই তিনি রাজনারায়ণবাবুর প্রকৃত রূপটির পরিচয় পাইয়াছিলেন। আমি তাঁহার শ্রদ্ধাবনত উক্তি শুনিয়া সত্যই ধন্য হইলাম।

রাজনারায়ণবাবুর প্রকৃতিতে এমনই একটি মহত্ত্ব ও প্রাণশক্তি ছিল যে, যে কোন ব্যক্তিই তাঁহার সান্নিধ্যে আসিলে প্রভাবিত না হইয়া পারিত না। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াই আমি সংযমশীল জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠি।

আমার মাতাপিতা ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং সংযমের পূর্ণ সমর্থক। সেই পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া স্বাভাবিকভাবেই আমার মধ্যে সংযত জীবনযাত্রার প্রতি নিষ্ঠা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তারপর কৈশোরে প্যারীচরণ সরকার ও ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেনের ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ পাই। তাঁহাদের দেবদুর্লভ চরিত্রের প্রভাব অলক্ষ্যে আমার চরিত্রগঠনে সহায়তা করে। মিতাচার দেখিতে অভ্যস্ত ছিলাম, একথা ঠিক, কিন্তু অমিতাচারকে আন্তরিক ঘৃণা তখনও করিতে শিখি নাই। এমন সময়ে রাজনারায়ণবাবুর সহিত পরিচয়—এ পরিচয় কল্যাণকর না হইয়া পারে নাই। তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াই অমিতাচারকে নূতন করিয়া ঘৃণা করিতে শিখিলাম। তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার কৈশোর ও যৌবনের যে সকল গল্প শুনিয়াছি তাহাই এখানে বিবৃত করিব—

রাজনারায়ণবাবুর পিতা বড়াল নিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর বসু রাজা রামমোহন রায়ের অনুগত ভক্ত ছিলেন। সে যুগে রামমোহন ছিলেন শিক্ষিত বাঙ্গালীদের প্রাণকেন্দ্র। রাজা রামমোহন রায়ের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ধারাটি একটু অদ্ভূত ধরণের ছিল। প্রাতঃকালে তিনি বাঙ্গালীদের মতই পিঁড়িতে বসিয়া হাত দিয়া খাইতেন। ব্রাহ্মণ পাচক তাঁহার রন্ধনাদি করিত। কিন্তু তাঁহার রাত্রের আহারটি ছিল একেবারে ইংরেজী ধরণের। সে সময় তিনি বন্ধুবান্ধব ও অনুগামীদের লইয়া টেবিল চেয়ারে বসিতেন এবং আনুষঙ্গীক আহার্য্য হিসাবে মদ্য পানও করিতেন। কিন্তু মদ্যের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সম্বন্ধে তিনি সব সময়েই অত্যন্ত সজাগ ছিলেন—নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের বেশী কাহাকেও মদ্যপান করিতে দিতেন না।

একদিন তাঁহার এক বন্ধু পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে কিছুটা বেশী মদ পরিবেশন করেন। রামমোহন তাঁহার বন্ধুটির এই নীতিবোধহীন রসিকতায় অতি মাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন—যে বন্ধু উচ্ছৃংখল জীবনযাত্রায় প্ররোচিত করে তাকে আমি বন্ধুই বলি নে।

এই ঘটনার পর হইতে তিনি উক্ত বন্ধুর সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দেন।

সে সময় রামমোহন রায়ের যুগ। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহাকে অনুকরণ করিতে উৎসুক। সুতরাং তাঁহার নৈশভোজের আসর হইতে মদ্যপানের রেওয়াজটি ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে অল্পকাল মধ্যে প্রসার লাভ করিল। বিশেষতঃ, তদানীন্তন সমাজ-সংস্কারকগণ মদ্যপান প্রভৃতিকে প্রগতির নিদর্শন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই সংযত হইয়া পরিমিত ভাবে মদ্যপান করিতেন। নন্দকিশোর বসুও রামমোহনের নৈশভোজসভার একজন নিয়মিত সভ্য ছিলেন।

সংস্কারকামী নেতাদের অনুকরণে মদ্যপান ক্রমে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও অল্পকাল মধ্যেই সঞ্চারিত হইয়া গেল। রাজনারায়ণ বসু ও মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি সতীর্থদের সহিত অল্প বয়স হইতে মদ্যপান করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বিপদ হইল এই যে, পদপ্রদর্শকগণ মিতাচারী হইলেও অপ্রাপ্তবয়স্ক অনুগামীরা সংযমের কোন ধার ধারিতে চাহে নাই। প্রথমতঃ অল্প বয়স, দ্বিতীয়তঃ বন্ধু-বান্ধবের সম্মিলনের ফলে উল্লাস বৃদ্ধি—ইহার ফলে মদ্যের মাত্রা নির্দিষ্ট পরিমাণকে অনেক সময় বহু দূরে অতিক্রম করিয়া যাইত।

রাজনারায়ণবাবুর পিতা তাঁহার পুত্রের অমিতাচার লক্ষ্য করিয়া অন্তরে বড় ব্যথা পাইলেন। পুত্রকে সংযত জীবনের দিকে ফিরাইয়া আনিতে তাঁহার ব্যগ্রতার সীমা রহিল না। একদিন পুত্রকে কক্ষে ডাকিয়া আনিলেন। আলমারী খুলিয়া একটি মদের বোতল বাহির করিয়া তাঁহাকে এক গ্লাস মদ দিয়া তাঁহার সম্মুখেই পান করিতে বলিলেন। পরে সস্নেহে বলিলেন—বাবা, তুমি সব সময় আমার সঙ্গে বসেই মদ্যপান করো—এতে আমি কিছুই মনে করব না। কিন্তু কথা দাও যে বন্ধুদের আড্ডায় বসে তুমি অপরিমিত মদ্য পান করবে না। মদ্যপান আমি অন্যায় মনে করিনে, কিন্তু সংযমহীন জীবনযাত্রাকে অবশ্যই ঘৃণা করি।

পুত্রের রক্তে তখন প্রাণপ্রাচুর্য্যের উত্তাল তরঙ্গ, পিতার নীতিবাক্য তারুণ্যের গতিবেগে কোন্ সুদূরে ভাসিয়া গেল। বন্ধুদের সাহচর্য্যে রাজনারায়ণের অপরিমিত মদ্যপান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উত্তরকালে তিনি যখন মেদিনীপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, তখনও তিনি অতিরিক্ত মদ্যপান করিতেন। এমনিতেই তাঁহার স্বাস্থ্য তেমন ভাল ছিল না। তদুপরি অপরিমিত মদ্যপান ও দায়িত্বের গুরুভারে—অল্পকাল মধ্যে তাঁহার স্বাস্থ্য না ভাঙ্গিয়া পারে নাই। ফলে, নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

বিগত জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রাজনারায়ণ অনুভব করিলেন যে, সুরার পায়ে তিনি তাঁহার স্বাস্থ্য ও অর্থ দুইই বিসর্জ্জন দিয়াছেন। যে মুহূর্ত্তে এই বেদনাদায়ক অনুভূতিটি জাগিয়া উঠিল সে মুহূর্ত্তে তিনি

আজীবন-সহচর মদ্যকে বর্জ্জন করিলেন—ক্ষণেকের জন্যও ইতস্ততঃ করিলেন না।

এ সময়ে যে কেহ তাঁহার নিকট যাইত তাহাকেই নিজের অকাল বার্দ্ধক্যের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেন—মদের উপাসনা করে জীবনের শেষ প্রান্তে যে বিষময় ফল লাভ করেছি তার নিদর্শন হচ্ছে আমার এ অত্যাচারক্লিষ্ট দেহটা। যৌবনের উচ্ছৃংখল জীবনযাত্রার সমুচিত প্রতিফল পেয়েছি—এর জন্য কাকে আর দোষ দেব? তবে নিজের জীবনের বিনিময়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা থেকেই বলছি, ওই বস্তুটি যেন কখনও তোমরা স্পর্শ ক'রো না।

প্রত্যেকটি বাক্যের সহিত যেন তাঁহার জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট আভাস পাইতাম। তাঁহার নিকট হইতে অহরহ এইরূপ সব কথা শুনিয়াই মদ্যপান ও অমিতাচারী জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমার বিতৃষ্ণা ও ভীতি জন্মিয়া যায়;

ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার হাওয়া তখন শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতিকে প্রায় অপাংক্তেয় করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালী সন্তান বাংলা না জানাকে তখন গৌরবের বিষয় বলিয়া গণ্য করিতেছে। এইরূপ বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়াও রাজনারায়ণবাবু কিন্তু তাঁহার জাতীয়তার আদর্শ হারাইয়া ফেলেন নাই। বাংলা-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগ এবং ইহার উন্নতির প্রতি একান্ত আগ্রহ আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। এতদিন আমি সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন করিতেছিলাম, কিন্তু রাজনারায়ণ-বাবুর সংস্পর্শে আসিবার পর নূতন করিয়া বাংলাসাহিত্য সাধনার দিকে দৃষ্টি পড়িল।

এই সময়ে বিখ্যাত মনীষী ও সমাজসেবী ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হয়। তাঁহার অনুগত ছাত্র ও ভক্তেরা মৃতের স্মৃতিরক্ষার্থ একটি সমিতি গঠন করেন, ইহার নিয়মিত অধিবেশনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাসংক্রান্ত প্রবন্ধ পাঠ হইত। তাছাড়া, সমাজ-সমস্যার নানা আলোচনাও ইহাতে চলিত। রাজনারায়ণবাবুও ডেভিড হেয়ারের ছাত্র হিসাবে এ সমিতির সদস্যদলভুক্ত হন।

জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা ও চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দান সম্পর্কে রাজনারায়ণ বাবুর তখন দেশজোড়া খ্যাতি। বন্ধুরা তাঁহাকে এ সমিতির এক সভায় তাঁহার নিজের রচনা পাঠের জন্য অনুরোধ করেন। ইংরেজি সাহিত্যে রাজনারায়ণ বাবু যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার বহু ইংরাজি রচনা সে সময়ে ইংরেজসমাজের সমাদৃত হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশী ভাষাকে দেশী ভাষার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করাকে তিনি একটুও পছন্দ করিতেন না—যদিও বাস্তবিকপক্ষে তখন শিক্ষিত সমাজে ইংরেজি ভাষাই ব্যবহৃত হইত। শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ইংরেজির মাধ্যমে কথাবার্তা বলিতেন ও সভাসমিতিতেই ইংরেজিতেই

বক্তৃতা দেওয়া হইত। বাংলা ভাষা তখন নিরক্ষর সমাজে ও মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

রাজনারায়ণবাবু তখন বন্ধুদের বলিলেন—তোমাদের সভায় যদি বাংলায় রচনাপাঠ অনুমোদন কর, তবেই আমি কিছু বলতে পারি, নতুবা নয়—একথা শুনিয়া বন্ধুরা তো অবাক্ ! অনেকে বিদ্রূপ করিলেন, কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু কহিলেন—রাজনারায়ণ, বলতো তোমার মাথায় এ অদ্ভুত খেয়াল এলো কি করে? সখ করে কেন এমন দুর্ণাম কুড়াবে, তার চেয়ে ইংরেজিতে প্রবন্ধ রচনা করেই পাঠ কর।

রাজনারায়ণবাবু কোন বাদপ্রতিবাদ করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মত পরিবর্ত্তনেরও বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। যথাসময়ে সভার কার্য্যসূচী অনুযায়ী বক্তারূপে তাঁহার নাম ঘোষণা করা হইল। উপস্থিত সভ্যেরা তো রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিয়া আছেন; কেহ কেহ আবার হাস্যকর দৃশ্যের অবতারণা হইবে, এ আশঙ্কায় সভাকক্ষই ত্যাগ করিয়া গেলেন।

সেযুগে রাজনারায়ণবাবুর এ অভিনব প্রচেষ্টা দুঃসাহসেরই পরিচয় দিয়াছিল। প্রকাশ্য সভায় বাংলাভাষায় বক্তৃতা দান বা রচনাপাঠের কথা ইতিপূর্ব্বে কোন শিক্ষিত বাঙ্গালী চিন্তাই করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন প্রমুখ মনীষীদের মধ্যেও কম আলোড়নের সৃষ্টি করে নাই। অনেকে সেদিন তাঁহার এ বাংলাভাষা-প্রীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া উঠেন।

ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে মন্দিরের উপাসনা ইংরেজিতে পঠিত হইত, কিন্তু এ ঘটনার পর সে প্রথা পরিবর্ত্তিত হইল। সে সময় মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিবার মত দক্ষ ব্যক্তি নিতান্ত কম ছিলেন না, কিন্তু ইংরেজ সভ্যতার মোহ এবং উন্মাদনায় শিক্ষিত সমাজ তখন প্রমত্ত। এই পরিবেশে কেহ সাহস করিয়া প্রকাশ্যভাবে বাংলাভাষাকে মর্য্যাদার স্থান দিতে অগ্রসর হন নাই। রাজনারায়ণবাবুই সর্ব্বপ্রথম এই পথ প্রদর্শন করেন এবং ইহার পর হইতেই প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দানের রীতি বাংলার শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত হয়।

শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু যে কেবল নির্ভীক দেশপ্রেমিক ছিলেন তাহাই নয়, তাঁহার অন্তরটিও ছিল কোমল এবং সহানুভূতিপূর্ণ। একবার একটি অতি সঙ্কটপূর্ণ সময়ে আমি তাঁহার যে সংস্কারমুক্ত, স্নেহকোমল মনের পরিচয় পাই তাহাই এখানে প্রকাশ করিতেছি।

সে সময়ে ব্রাহ্মবিবাহ বিল পাশ লইয়া ব্রাহ্ম সমাজে দুইটি বিরোধী দলের সৃষ্টি হয়। রাজনারায়ণ বসু তখন আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি। তিনি

ব্রাহ্মবিবাহ বিল পাশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন, অপর পক্ষে কেশব সেন প্রবর্ত্তিত নববিধান সমাজ বিল পাশ করিতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। দেশব্যাপী তখন বিরাট আন্দোলন চলিতেছে।

আমি নববিধান সমাজের একজন বিশিষ্ট সমর্থক। প্রকাশ্য সভায় রাজনারায়ণ বসুর বিরুদ্ধে আমি প্রচার কার্য্য চালাইতেছে—তিনি সে কথা জানিতেন। এই সময় ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমি কয়েকবার তাঁহার নিকট যাই। তাঁহার আন্তরিক ব্যবহারে তখন বিস্মিত না হইয়া পারি নাই। আমি যে তাঁহার বিরুদ্ধ দলভুক্ত সে কথা তিনি সে সময় একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। সস্নেহে আমায় অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং তাঁহার আচরণে বা কথায় আমার মত বিরুদ্ধদলভুক্ত ব্যক্তির প্রতি বিন্দুমাত্র উষ্মারও আভাষ পাইলাম না। উদার সংস্কারমুক্ত এই বিরাট পুরুষের স্পর্শে সেদিন ধন্য হইলাম—বুঝিলাম, কোন প্রকার দলীয় বিরোধ তাঁহার মহান ব্যক্তিত্বের উপর সঙ্কীর্ণতার কোন রেখাপাতই করিতে পারে নাই।"

শেষজীবনটি রাজনারায়ণবাবু দেওঘরে অতিবাহিত করেন। এখানকার একান্ত নির্জ্জনতার মধ্যে তিনি কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন এবং স্বদেশ ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার লেখার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একদল সমাজসেবী হিন্দুধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁহার দেওঘরে থাকাকালে আমি একাধিকবার সেখানে উপস্থিত হই। তখন দেখিতাম, জীবনের শেষভাগে গভীরভাবে তিনি অধ্যাত্মসাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। প্রায় সর্ব্বদাই তিনি উপনিষদ, হাফিজ, মাদাম গুইয়ান প্রভৃতি মরমিয়া সাধক সাধিকার গ্রন্থ লইয়াই সময় কাটাইতেন।

আমি একবার কোন কর্ম্ম উপলক্ষে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাইতেছি। আমার সহিত আরও তিনচারজন সঙ্গী রহিয়াছেন। পথে দেওঘর পড়িবে, তাই রাজনারয়ণবাবুকে একবার দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। সঙ্গীদের লইয়াই রাজনারায়ণবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

রাজনারায়ণবাবুর প্রাতরাশ তখন সবেমাত্র শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাদের আগমন সংবাদ পাইবামাত্র বৃদ্ধ সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানাইয়া অন্দরে লইয়া গেলেন। কথা প্রসঙ্গে নানা আলোচনা শুরু হইল এবং তন্ময় হইয়া তিনি হাফিজ ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে অনর্গল আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। সে আবৃত্তি আমার খুবই ভাল লাগিতেছিল, কিন্তু সঙ্গিগণ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নহেন, তাই তাঁহাদের কথা ভাবিয়া অস্বাস্তিবোধ করিতেছিলাম। তাছাড়া, তাঁহারা পথশ্রমে ক্লান্ত, একথা ভাবিয়াও একটু বিব্রত বোধ না করিয়া পারি নাই।

কিন্তু বৃদ্ধের সেই আবেশ-বিভোর মুখের দিকে তাকাইয়া বাধা দিতে ইচ্ছা হইল না। ইতিমধ্যেই তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ হইতে আবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছেন। এমন সময় রাজনারায়ণ বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র যোগীন আসিয়া জানাইল যে, স্নানের জল প্রস্তুত। এ কথা শুনিয়া যেন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। শিশুসুলভ হাসিতে ঘরখানি ভরিয়া ফেলিয়া তিনি বলিলেন—সত্যিই তো! আমার বুদ্ধি দেখলে? তোমরা পথশ্রান্ত, অথচ তোমাদের স্নানাহারের ব্যবস্থা না করে আমি বক্তৃতা জুড়ে দিয়েছি! আচ্ছা, তোমরা এখন খাওয়া দাওয়া কর গিয়ে, পরে এ সম্পর্কে আলোচনা হবে।

মনস্বী বৃদ্ধের এ অপূর্ব্ব সরলতায় আমার সঙ্গীরা সেদিন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা জানিত বা অজানিতভাবে সকল মানুষকে আকৃষ্ট করিত। রাজনারায়ণবাবু যখন দেওঘরে বাস করিতেছিলেন সে সময়ে তাঁহার বাসস্থানটি একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। তাঁহার বন্ধু ভক্ত, অনুরাগী ছাত্র ও জনসাধরণের সমাগমে সেসময়ে দেওঘরের জনবিরল অঞ্চলটি মুখরিত হইয়া থাকিত। দেওঘরের নিকটে কোথাও কখনো কর্ম্মোপলক্ষে গমন করিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার লোভ কেহই সম্বরণ করিতে পারিতেন না। এ যে কিসের আকর্ষণ তাহা অনেকেই বুঝিতেন না।

কেবল যে শিক্ষিত বাঙ্গালীদেরই তাঁহার সম্পর্কে শ্রদ্ধা ছিল তাহা নয়, বৈদ্যনাথ মন্দিরের রক্ষণশীল পুরোহিতেরা বা নিরক্ষর ব্যক্তিরাও রাজনারায়ণ বাবুর নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তকর মস্তকে ঠেকাইত। সে সময়ে হিন্দুসমাজ ত্যাগীদের সম্পর্কে পুরাতন পন্হীরা অত্যন্ত সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু রাজ-নারায়ণবাবু সম্পর্কে এই সাধারণ মনোবৃত্তির ব্যতিক্রম সকল সময়ে দেখা যাইত। এ সম্পর্কে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলিব।

—একবার আমি দেওঘরে যাইতেছি। ট্রেণটি মধুপুর ষ্টেশনে থামিতেই বৈদ্যনাথ মন্দিরের পাণ্ডার দল আমাদের কামরায় উঠিয়া পড়িল। যাত্রীরা কোথায় যাইবে, পাণ্ডা চাই কিনা, পাণ্ডা নিয়োগ অপরিহার্য্য কেন, এসব নানা কথা বলিয়া তাহারা বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

একটি পাণ্ডা আমার সম্মুখে আসিয়া এসব বলিতেই আমি হাসিয়া বলিলাম—আমি তীর্থযাত্রী সত্য, কিন্তু আমার পান্ডা আগে থেকেই ঠিক করা আছে।

পাণ্ডাটি তাহাদের দলের সকলকেই চেনে, কাজেই আমার কথা শুনিয়া সে সাগ্রহে তাহার নাম জানিতে চাহিল। আমি হাসিয়া বলিলাম—আমার পাণ্ডার নাম শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

পাণ্ডাটি শ্রদ্ধার সহিত যুক্তকর নিজ মাথায় ঠেকাইয়া বলিল—উনি

আমাদের আর এক বৈদ্যনাথ বাবা।

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলাম—সে কি কথা? উনি তো হিন্দুর দেবদেবী মানেন না, তাছাড়া ব্রাহ্ম সমাজের লোক। একজন ভিন্ন ধর্ম্মীয় ব্যক্তি তোমাদের বৈদ্যনাথ বাবা হচ্ছেন কিরূপে?

আত্মপ্রত্যয়ের সহিত সে উত্তর দিল তিনি ধার্ম্মিক কি ভিন্নধর্ম্মী সে বিচার জানি না শুধু এটুকুই জানি যে, তিনি সাধারণ মানুষ নন, ঐশীশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ।

মহান পুরুষের সম্পর্কে এই নিরক্ষর পাণ্ডার উক্তি শুনিয়া আমি হতবাক হইয়া রহিলাম।

রাজনারায়ণবাবুর পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইবার সংবাদ পাইয়া শেষবারের মত দেওঘরে যাই। সে সময়ে তাঁহার অবস্থা অতিশয় সংকটজনক। দেওঘরের অধিবাসীরা উৎকণ্ঠায় দিন যাপন করিতেছে। এ ক্ষুদ্র শহরটির উপর সেদিন যেন নিয়তির এক অবশ্যম্ভাবী নিষ্ঠুর আঘাত আসন্ন। তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া সর্ব্ব জাতি ও বর্ণের এক মহামিলন দেখিলাম। এ দৃশ্য অবর্ণনীয়। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, শিক্ষিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন সকলেই মহাত্মার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া দুশ্চিন্তায় প্রহর যাপন করিতেছে। স্থানীয় এক খৃষ্টান, অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ রাজকর্ম্মচারী রাজনারায়ণ বাবুর অন্তিম শয্যার নিকটে নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। বৈদ্যনাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত উদ্বিগ্ন হইয়া সকাল সন্ধ্যায় তাঁহার সংবাদ লইতেছেন।

দুইদিন সেখানে থাকিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। ট্রেনে এক রক্ষণশীল বাঙ্গালী লেখকের সহিত পরিচয় ঘটিল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার গুরুদেব দেওঘরের নিকটবর্ত্তী এক পাহাড়ে অবস্থান করিতেছেন। গুরুর সান্নিধ্যলাভের উদ্দেশে তিনি সেখানে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে রাজনারায়ণ বসুর গুরুতর অসুখের সংবাদে বিচলিত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য তিনি দেওঘর যাত্রা করেন। আমি বিস্ময়ের সহিত ভাবিতে লাগিলাম কে এই মহামানব যাঁহার আসন্ন বিয়োগ-ব্যথায় দিগ্‌দিগন্তের এত লোকের মন আজ এরূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

রাজনারায়ণবাবুর এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল যে, তাঁহার সান্নিধ্যে আসিলে যেকোন মানুষই ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা বিস্মৃত না হইয়া পারিত না। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি এক সময় সতীর্থ রাজনারায়ণ বসুর গলদেশে স্বীয় উপবীত পরাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—রাজনারায়ণ, অব্রাহ্মণকুলে জন্মালেও তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, এ উপবীত তোমার গলাতেই শোভা পায়। তোমার অকৃত্রিম ব্রাহ্মণত্ব আমার ভেতরে সঞ্চারিত হলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিন পরই এই মহামানবের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হয়।

মেদিনীপুরের জনসাধারণ আজিও শ্রদ্ধাভরে তাঁহার স্মৃতিতর্পণ করিয়া থাকে। তিনি মেদিনীপুর বিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর সেখানকার অধিবাসিগণ তাঁহার বসবাসের জন্য একটি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। অবশ্য রাজনারায়ণ বাবু অতঃপর মেদিনীপুর ত্যাগ করেন এবং সে গৃহে তিনি আর বাস করেন নাই।

মেদিনীপুরে তাঁহার এক উকিল বন্ধুর পিতা অতিশয় ব্রাহ্মবিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু সেই বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবুর নাম শুনিলেই মাথায় হস্ত ঠেকাইয়া বলিয়া উঠিতেন—তাঁর কথা স্বতন্ত্র, তিনি মানুষ নন—মানুষের মূর্ত্তিতে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে তাঁর ভেতর।

বৃদ্ধের এ বিশ্বাসের কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—শত্রু, মিত্র নির্ব্বিশেষে সকলকে এমন আপন করবার শক্তি কোন মানুষের থাকে না। আবার এটাও লক্ষ্য করেছি যে, তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব জনসমুদ্রের উর্দ্ধে, উন্নত মস্তকে স্বীয় মহত্ত্বে বিরাজ করছে। এ কি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব? তিনি অন্য জগতের মানুষ।

রাজনারায়ণবাবুর দেবদুর্ল্লভ চরিত্রে রসবোধের এক প্রচ্ছন্ন প্রবাহ ছিল। কলিকাতার নিকটস্থ হরিনাভি নামক স্থানের ব্রাহ্ম সমাজের বাৎসরিক অধিবেশনে তিনি একবার উপস্থিত ছিলেন। উৎসবের আনন্দে সেদিন সকলেই মত্ত, আমাকে দেখিয়া রাজনারায়ণবাবুর রসিক-মনটি যেন মুখর হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—আচ্ছা এসো, কে কত মজার গল্প বলতে পারে তা আজ দেখ্‌বো।

সমস্ত রাত্রি তাঁহার ও আমার মধ্যে সেদিন হাসির গল্পের প্রতিযোগিতা চলিল। সকলে তো তাঁহার কৌতুক কাহিনীগুলি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

কর্ম্মময়, কল্যাণময় জীবনের দীপ্তিটি জনচিত্তে জাগরূক রাখিয়া বিরাট পুরুষ রাজনারায়ণ মরজগৎ ত্যাগ করিয়া অমৃত-পথযাত্রী হইয়াছেন। নববঙ্গের নূতন জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক ও পথিকৃৎরূপে দেশবাসী চিরদিন তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ না করিয়া পারিবে না।

আনন্দমোহন বসু

প্রতিভাধর আনন্দমোহন বসু সমকালীন ছাত্রসমাজে একটি মর্য্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় ছাত্রমহলে তিনি আদর্শস্থানীয় হন। শিক্ষকগণ সকল সময়ই ছাত্রদের আনন্দমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে বলিতেন। সে যুগের বহু শিক্ষার্থীর অন্তরে আনন্দমোহনের মত কৃতী হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রচ্ছন্ন থাকিত। ছাত্রজীবনে আমি একাধিকবার তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার সম্পর্কে বহু কথাও শুনিয়াছি। ফলে, এই বহুশ্রুত ব্যক্তিটির স্মৃতি আমার অন্তরে একটি স্থায়ী রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়। দূর হইতে তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হইত, তিনি যেন আমার অতি নিকট আত্মীয়, যদিচ তখনও আমার সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটে নাই। নিজের অজ্ঞাতে কি জানি কেন, মনে মনে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া পারি নাই।

পরিচয়ের পূর্ব্বেই যে ভালবাসা জন্মে, আবার একটি বিশেষ ঘটনার মধ্য দিয়া সে-ভালবাসা স্থায়িত্ব লাভও করে। ঘটনাটি ঘটে আকস্মিকভাবে।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস। ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেনের পৌরোহিত্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম মন্দিরের এক অনুষ্ঠানে আমি ও আনন্দমোহন বসু ঘটনাচক্রে এক সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হই। ঠিক দীক্ষার দিনেই পরস্পরের এ পরিচয় যেন আমার নিকট বিশেষ অর্থপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া সেদিন আমাদের দুইজনের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হইল উত্তরকালে কোন অবস্থাতেই তাহা ছিন্ন হয় নাই।

আমি তখন ব্রাহ্ম সমাজের একজন বিশেষ উৎসাহী কর্ম্মী, আনন্দমোহনেরও কর্ম্মোদ্যমের অন্ত নাই। তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়া লক্ষ্য করিলাম, এই অল্প বয়সেই তাঁহার কি গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠা। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার এই অসীম অনুরাগই আমাকে তাঁহার সহিত চিরবন্ধনে বাঁধিয়া ফেলে। ফলে, তিনি আমার পরম প্রিয় না হইয়া পারেন নাই। বয়সের দিক দিয়াও অবশ্য তিনি এবং আমি সমবয়সী ছিলাম। সমবয়সের আকর্ষণ ও সহধর্ম্মিতার ফলে আমরা পরস্পরকে যেন ক্রমেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিলাম।

দীক্ষা গ্রহণের মাত্র কয়েক মাস পরেই আনন্দমোহন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন এবং ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে কেশব সেনের সহিত ইংলণ্ড যাত্রা করেন। বিদেশে তাঁহার চার বৎসর অতিবাহিত হয় এবং এই সময়ের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে যে আলোড়ন ও সংঘাত আরম্ভ হয় তাহা প্রকাশ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কেশব সেনের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মসমাজে তখন অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। নারীশিক্ষা ও নারী প্রগতিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত সমাজ ক্রমে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল।

কেশব সেন ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া একটি নারীশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আমি সেই শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হই। অতি-প্রগতিপন্থী সদস্যেরা কেশববাবুর নারীশিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিলেন—বর্ত্তমান শিক্ষাকেন্দ্রে নারী স্বাধীনতা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহার প্রতিবিধানকল্পে তাঁহারা আর একটি নারীশিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ব্বোক্ত শিক্ষালয় অপেক্ষা আরও ব্যাপক করা হইল। এই অতি-প্রগতিপন্থীদের অধিনায়ক ছিলেন দুর্গামোহন দাস ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

অল্পকাল পরেই আর এক সমস্যা দেখা দিল। এ সময়ে একদল সদস্য বলিতে শুরু করিলেন, মহিলা সভ্যদের সমাজের সাধারণ অনুষ্ঠানগুলিতে পর্দ্দার বাহিরে বসিতে দিতে হইবে। সে সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের অনুষ্ঠানে মহিলাদের পর্দ্দার অন্তরালে বসিবার ব্যবস্থা ছিল। কেশব সেন ও তাঁহার অনুগামী ভক্তেরা প্রথমতঃ এই আন্দোলন সমর্থন করেন নাই। ফলে, বিরুদ্ধদল সমাজ-মন্দিরে আসা বন্ধ করিয়া দেন এবং স্বতন্ত্র স্থানে সাপ্তাহিক উপাসনার ব্যবস্থা করেন।

এজাতীয় মতানৈক্য লইয়া ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তখন এক বিশৃঙ্খল অবস্থার উদ্ভব হয়। একদল সদস্য আবার এই সময়ে সমাজের কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য অবিলম্বে একটি নিয়মতান্ত্রিক কর্ম্মপরিষদ গঠনের দাবী জানান। ইহাতে আমারও পরিপূর্ণ সমর্থন ছিল। সমাজের কাজকর্ম্মের বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি একটি ব্যবস্থাপক কর্ম্মপরিষদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলাম।

এই সংকটকালে বন্ধুবর আনন্দমোহন ইংলন্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। আমি সে সময় সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আনন্দমোহনের বাসস্থান সাউথ সারকুলার রোডে, আমার বাসস্থান সেখান হইতে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। সুতরাং প্রতিদিনই তাঁহার সহিত আমার দেখা হইত। এই সময়ে আমি তাঁহার পরিবারের প্রত্যেকের সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ লাভ করি। অল্পকাল মধ্যেই আনন্দমোহনের স্ত্রী, ভগিনী ও পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়েরাও আমার সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠেন। আমি প্রতিদিন তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা, দেশের কথা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিতাম।

আনন্দমোহনের প্রাণপ্রাচুর্য্য দেখিয়া আমি প্রায়ই বিস্মিত হইয়া যাইতাম। আমার নিকট হইতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংকটের কথা শুনেন, প্রথমদিকে বিরুদ্ধবাদীদের ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তিতে ব্যথিতও হন। কিন্তু ইহার পর যখন জানিতে পারেন যে নারীপ্রগতি ও নারীশিক্ষা সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়াই এই আন্দোলনের সূচনা, তখন অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তিনি বিরুদ্ধবাদীদের সমর্থন করেন।

প্রগতিপন্থীদের নেতাদ্বয় দুর্গামোহন দাস ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী নবপ্রবর্ত্তিত নারীশিক্ষা কেন্দ্র লইয়া তখন বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আনন্দমোহন ইঁহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ইহার অল্পকাল পর হইতে শিক্ষাকেন্দ্রের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিতে থাকেন। আমায় একদিন বলেন—দেখ শিবনাথ, নারীশিক্ষার প্রসার ও প্রগতি ছাড়া কোন দেশ উন্নতি লাভ করতে পারে না। এতে প্রত্যেকেরই কি সমর্থন থাকা উচিত নয়?

কেশব সেনের প্রতিষ্ঠিত সমাজ মন্দিরের সাহায্যদাতাদের লইয়া একটি ব্যবস্থাপক কমিটি গঠনের যে প্রস্তাব আমরা করি তাহার কোন মীমাংসা তখনও হয় নাই। ব্রহ্মবান্ধব নিজে এ সম্পর্কে তখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বিরুদ্ধবাদী সদস্যেরা এই আন্দোলনটিকে কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে 'দি লিবারেল' নামে একখানি মাসিকপত্র বাহির করিয়া নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে থাকেন। আমি সেই পত্রিকাটির সম্পাদক হই।

অল্পকাল মধ্যেই আনন্দমোহনের বাসগৃহখানি প্রগতিপন্থী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কেন্দ্রে পরিণত হইল। সেখানে তৎকালীন সমস্যা ও উহার সমাধানের উপায় লইয়া সকলেই চিন্তা করিতেন। বিশেষ করিয়া দুটি বিষয়ের উপরই তখন আমাদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয়। প্রথমতঃ, তৎকালীন শিক্ষার্থীদের উন্নতির জন্য স্থায়ী কিছু কাজ করা—দ্বিতীয়তঃ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের দাবী উত্থাপন ও মান উন্নয়ন কল্পে একটি রাজনৈতিক সমিতির প্রতিষ্ঠা। সে সময় অবশ্য মাননীয় কৃষ্ণদাস পালের নেতৃত্বে একটি সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করে এবং দেশের কল্যাণার্থে অনেক কাজও করে। কিন্তু উক্ত সংস্থা বিশেষভাবে দেশের বিত্তশালী ও অভিজাত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত উহার কোন সম্পর্কই ছিল না। বস্তুতঃ মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার সমস্যা বা প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করিবার কোন প্রতিষ্ঠানই ছিল না।

আনন্দমোহনের গৃহে আগত ব্যক্তিরা সকলেই এ অসুবিধার কথা চিন্তা করিতেন, উহার সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করিতে চাহিতেন। এই ব্যাপারে আনন্দমোহনের নিজের উৎসাহ ছিল অত্যধিক।

দেশবরেণ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির প্রভাব প্রতিপত্তি তখন অসামান্য।

মধ্যবিত্তদের মুখপাত্র হিসাবে একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব তাঁহার নিকট করায় তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত হন এবং নিজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। ইহার পর তিনি আমাদের সভায় একাধিক বার যোগদান করেন ও ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়া সকলকে অনুপ্রেরণা দেন। জনসাধারণ ও নেতৃবর্গের সম্মিলিত উদ্যমের ফলে পরিশেষে একটি ভারতীয় সংসদ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আমি ও আনন্দমোহন একদিন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের প্রস্তাব লইয়া যাই। তিনি সমস্ত বিষয়টি শুনিলেন এবং কি ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে তাহার নির্দ্দেশও দিলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং কোন অংশ গ্রহণে সম্মত হইলেন না।

অবশেষে আলবার্ট হলে একটি জনসভায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির একটি সন্তান ঠিক ইহার একদিন পূর্ব্বে মারা যায়। আমরা ধরিয়া লইয়াছিলাম যে, এ অবস্থায় তাঁহার উপস্থিতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সন্তানবিয়োগ তাঁহাকে কর্ম্মবিমুখ করিতে পারে নাই। তিনি ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়েই আসিয়া সভায় যোগদান করেন।

আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি নবপ্রবর্ত্তিত এই সমিতির পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ান। আনন্দমোহন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সেক্রেটারী হওয়ার সম্মান লাভ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনও আরম্ভ হইল। বসু ও ব্যানার্জ্জির তেজোদৃপ্ত বক্তৃতায় ছাত্রসমাজ সে সময়ে উদ্দীপিত হইয়া উঠে ও সরকারের নিকট নিজেদের দাবী জানাইতে অগ্রসর হয়।

এ ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে আমি হেয়ার স্কুলে সংস্কৃতের শিক্ষিকতায় নিযুক্ত হই এবং ভবানীপুর হইতে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে বাসা বদল করি। সে সময়টি খুব সম্ভবতঃ ১৮৭৭ সাল। আমি একদিন হঠাৎ খুব অসুস্থতা বোধ করিতে থাকি এবং এই অসুস্থতা ক্রমে যেরূপ বাড়িয়া উঠে তাহাতে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন সকলেই আমার জীবনের আশা প্রায় ছাড়িয়া দেন।

এই দুঃসময়ে আনন্দমোহনের সান্নিধ্য যেন আমায় জীবনে সঞ্জীবনী সুধার কার্য্য করিয়াছিল। আমার বন্ধুর জীবনটি তখন কর্ম্মচঞ্চল, কিন্তু শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও দিনান্তে আমার রোগশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইতে একদিনও ভুল করেন নাই। তাঁহার এই আন্তরিকতা আমার মনের তন্ত্রীতে স্পন্দন না জাগাইয়া পারে নাই। তাঁহার আসিবার সময়টি সন্নিকট হইলেই যেন আমার দেহ মন সেই উপস্থিতির অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া উঠিত। কোন মানুষের সান্নিধ্য বা কথায় যে এমন স্নিগ্ধতা থাকিতে পারে, তাহা জানা ছিল না। আনন্দমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সকলেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের এ কল্যাণ-স্পর্শটি অনুভব করিতেন—

রোগশয্যায় বন্ধুর এ সান্নিধ্য তখনকার মত আমার বহু জ্বালাযন্ত্রণার উপশম করিত।

জীবনে কত বিচিত্র চরিত্রের মানুষের নিকটে আসিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, বহু আদর্শ পুরুষের পায়ের নীচে বসিবার সৌভাগ্যও হইয়াছে, কিন্তু আনন্দমোহনের মত এমন একটি প্রেমমধুর চরিত্র বড় বেশী দেখি নাই। তাঁহার প্রেমের স্পর্শে তাঁহার গৃহটি যেন স্বর্গে পরিণত হইয়াছিল। আনন্দমোহনের পারিবারিক জীবনের মাধুর্য্য আমাদের আলোচনার বস্তু ছিল, অনুকরণীয় বলিয়াও উহাকে আমরা মনে করিতাম।

কোর্ট হইতে ফিরিয়াই প্রতিদিন তিনি জননীর কক্ষে প্রবেশ করতেন। বৃদ্ধা তখন হয়ত নিঃশব্দে হরিনামের মালা জপ করিতেছেন। গায়ের কোটটি খুলিয়া সেই অবস্থায় পুত্র মায়ের কোলে কিছুকাল চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতেন। হরিনামের মালা রাখিয়া দিয়া জননী যতক্ষণ না আদর করিয়া উঠিতে বলিতেন, ততক্ষণ এমনি ভাবেই পড়িয়া না থাকিয়া আনন্দমোহন ছাড়িতেন না! এই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের অন্তরের অন্তস্তলে ছিল একটি মাতৃভক্ত অবোধ শিশু, মাতৃস্নেহ সিঞ্চনে যাহা সুস্নিগ্ধ হইয়া উঠিত। পরিণত বয়স পর্য্যন্ত মাতাপুত্রের মধ্যে এমন মধুর সম্পর্ক বজায় থাকিতে আমি আর কখনো দেখি নাই।

এই প্রসঙ্গে আনন্দমোহনের মাতৃদেবীর সম্পর্কে কয়েকটি কথা লিখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ভারতের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের ব্রত লইয়া বহু প্রতিভাধর বঙ্গসন্তান অগ্রসর হন। তাঁহারা প্রত্যেকেই এই মহাব্রত উদ্‌যাপনের অনুপ্রেরণা পান তাঁহাদের মাতা, পত্নী প্রভৃতির নিকট হইতে। সে যুগের ধর্ম্মনিষ্ঠা, ভক্তিমতী নারীরা ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। আনন্দমোহনের মাতাঠাকুরাণীও ছিলেন এই শ্রেণীর এক আদর্শ মহিলা।

এমন কর্ত্তব্যপরায়ণা ভক্তিমতী মহিলা, জীবনে আমি খুব বেশী দেখি নাই। বন্ধুবর যখন নেহাৎ অল্পবয়স্ক সেই সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু ঘটে। আনন্দমোহনের মাতারও সে সময় নিতান্ত অল্প বয়স। কিন্তু এই বুদ্ধিমতী তরুণী অভিভাবকহীন সংসারের সমস্ত দায়িত্ব স্বহস্তে তুলিয়া নেন এবং সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা ও জমিদারী সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম সমস্তই নিজে তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন।

সেকালে গ্রাম্যসমাজে যেমন কতকগুলি সুন্দর পরিবেশ ছিল তেমন কুসংস্কারও নিতান্ত কম ছিল না। গ্রাম্য জীবনে প্রায়ই একদল পরশ্রীকাতর প্রতিবেশী থাকিত, যাহারা অন্যের সম্পর্কে অপপ্রচার করিয়া অকারণে অশান্তির সৃষ্টি করিত। কিন্তু বন্ধুবরের মাতা এরূপ তেজস্বিনী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না

মহিলা ছিলেন যে, তাঁহার সম্পর্কে কেহ কোনদিন বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে সাহস করে নাই। এই বালবিধবা আজীবন স্বীয় সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, শুচিতা দ্বারা শ্বশুরকুলের মর্য্যাদা ও ঐতিহ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন। সাংসারিক জীবনে তাহাকে বহু বিরুদ্ধ পরিবেশের সম্মুখীন হইতে হয় কিন্তু ক্ষণেকের জন্যও কেহ তাঁহাকে ভগ্নোৎসাহ হইতে দেখে নাই।

আনন্দমোহনের মাতাঠাকুরাণীর পতিভক্তি ছিল অপূর্ব। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার নিজ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি একাগ্র ভাবে সমগ্র অন্তর দিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে আনন্দমোহনের পিতা সম্মর্কে কথা উঠিতেই বৃদ্ধা ক্ষণেকের জন্য আমাদের থামিতে ইঙ্গিত করিলেন, তারপর যুক্তকর মস্তকে ঠেকাইবার পর আমাদের অলোচনায় অগ্রসর হইতে অনুমতি দিলেন। ঘটনাটি আমার চিত্তে কৌতূহলের সঞ্চার করে, আমি এবিষয়ে আনন্দমোহনকে প্রশ্ন করি। উত্তরে বন্ধুবর বলিলেন—বাবার মৃত্যুর পর থেকে দেখে আসছি, যখনই তাঁর সম্পর্কে কোন কথা হয় তখনই মা ক্ষণেকের জন্য তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে যুক্তকর মস্তকে স্পর্শ করেন। আমার পিতৃদেবের স্মৃতি যেন মায়ের সমস্ত জীবনে একেবারে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে।

আনন্দমোহন তাঁহার মায়ের কথা বলিতে বলিতে যেন আত্মহারা হইয়া উঠিতেন। তিনি বলিতেন—মায়ের যে কেবল স্বামী সম্পর্কেই ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল তাই নয়, তাঁহার অন্তর এমন উদার ছিল যে, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে যে কোন মহৎ বস্তুই উহাতে স্পন্দন জাগাইয়া তুলিত। পথে যাইতে যাইতে তিনি যদি কোন মুসলমান ফকীরের গোরস্থান অথবা দরগা দেখিতেন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া অবতরণ করিতেন ও শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া নিরস্ত হইতেন না।

আনন্দমোহনের নিকট শুনিয়াছি, একবার তাঁহার মা পুরীতে জগন্নাথ দর্শনের জন্য প্রস্তুত হন। সে সময় জলপথ ব্যতীত সেখানে যাওয়া যাইত না। ষ্টীমার ভাড়া করিয়া সকলে মিলিয়া তীর্থ দর্শনে যাওয়ার কথা। কিন্তু কি কারণে যেন বন্ধুবরের মাতার যাত্রা স্থগিত হয়, অপর যাত্রীরা অবশ্য রওনা হইয়া যায়। পরে জানা গেল, প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝায় ষ্টীমারটি সমস্ত যাত্রীসহ নিমজ্জিত হইয়াছে। সংবাদটি আনন্দমোহনের মায়ের নিকট পেঁীছিলে তিনি নিজে রক্ষা পাওয়ায় একটুও খুশী হন নাই বরং দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া বলিতে থাকেন—জগন্নাথ দর্শন করবার পথে যাদের মৃত্যু হয় তাদের পুণ্যের সীমা নেই। আমি কি সে ভাগ্য করে এসেছি? তাইতো ঘটনাচক্রে আমার ওই ষ্টীমারে সেদিন যাওয়া ঘটে উঠলো না।

কথাগুলি বলিতে বলিতে তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে থাকে।

আনন্দমোহনের মুখে তাঁহার পুণ্যময়ী মাতৃদেবীর জীবনকাহিনী শুনিতে শুনিতে আমিও মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। বহুদিন একাদিক্রমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার মায়ের জীবনকাহিনী শুনিয়া ধন্য হইয়াছি।

উত্তরাধিকারসূত্রে মায়ের চরিত্রের ঐশ্বর্য্য পুত্রের চরিত্রে সঞ্চারিত না হইয়া পারে নাই। আনন্দমোহনের সহিত যত গভীরভাবে মিশিয়াছি ততই এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, অমন মহীয়সী মা না হইলে এরূপ পুত্র জন্মে না।

আনন্দমোহনের বন্ধু ও স্বজন-প্রীতি বড় প্রবল ছিল। যাহার সহিতই তাঁহার যোগাযোগ ছিল সে-ই! যেন তাঁহার বিরাট চিত্তের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া থাকিত। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর এম, এম, বসুর আমেরিকা হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের দিনটি আমি আজিও ভুলিতে পারি না। ঘটনাটি অতি সাধারণ কিন্তু সেই ছোট ঘটনাটুকুর পটভূমিকায় আনন্দ-মোহনের বিরাট চরিত্রটি আমার সম্মুখে সেদিন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ডক্টর এম, এম, বসু বিদেশে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন। কলিকাতায় পৌঁছিবার দিনটি ক্রমে কাছে আসিল, আনন্দমোহনের আনন্দ যেন বাঁধ মানে না। নির্দ্দিষ্টদিনে যথাসময়ে বাড়ীর সম্মুখে গাড়ীর শব্দ শুনিয়া আমরা দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিলাম ও সদ্য প্রত্যাগত তরুণকে অভিনন্দন জানাইলাম। আনন্দমোহনের ভাবাবেগ আমাদের বিস্মিত করিল। দীর্ঘ অদর্শনের পর ভ্রাতার সহিত সাক্ষাতের আনন্দটি যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পরিস্ফুট। তাঁহাকে একরূপ কোলে তুলিয়া তিনি বসিবার কক্ষে আনিলেন ও আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। ভাইয়ের প্রতি তাঁহার যে কি গভীর স্নেহ ভালবাসা, তাহা সেদিন আমি অনুভব করিলাম। সমস্ত অন্তর দিয়া এমন করিয়া কেহ যে কাহাকেও ভালবাসিতে পারে তাহা জানিতাম না। আমি একেবারে অবাক হইয়া তাঁহার স্নেহবিহ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এক কঠিন রোগ ভোগের পর আমি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মুঙ্গেরে গমন করি। আনন্দমোহনের শ্যালকও এক কঠিন ব্যাধি হইতে রক্ষা পায়, ডাক্তারেরা তাঁকেও চেঞ্জে নিয়ে যাইবার পরামর্শ দেন। আমি মুঙ্গেরে আসিবার কয়েকদিনের মধ্যে আনন্দমোহনও তাঁহার স্ত্রী, পীড়িত শ্যালক এবং শ্বশুরবাড়ীর কয়েকজন আত্মীয়স্বজন লইয়া সেখানে আগমন করেন। মুঙ্গের বাসের কয়েকদিন পর একটি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় আমাদের পরিবারটি শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। আমার কনিষ্ঠা কন্যা হঠাৎ একদিন ছাদ হইতে পড়িয়া মারা যায়।

বলা বাহুল্য, আমার স্ত্রী শোকে অভিভূতা হইয়া পড়িলেন। আনন্দমোহন সবেমাত্র সেখানে আসিয়াছেন। দুঃসংবাদ শুনিয়া তিনি

আমাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহার পর প্রতিদিনই আমাদের গৃহে আসিয়া দীর্ঘকাল তিনি আমার শোকার্ত্তা স্ত্রীর সহিত নানা আলাপে সময় কাটাইতেন। তাঁহার প্রকৃতি এমনই মধুর যে, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আমার স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে গণ্য হন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত চিত্ত আনন্দমোহনের সহানুভূতির স্পর্শে শান্ত হইয়া উঠে। তিনি মাঝে মাঝে আমায় বলিতেন—মানুষের প্রকৃতির মাধুর্য্য যে চেহারায় ফুটে ওঠে তা আনন্দবাবুকে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। তাঁর মধ্যে এমন একটি প্রশান্তি ও পরিপূর্ণতা রয়েছে যে, তিনি যখন কথা বলেন তখন তীব্র শোকও যেন অনেকাংশে হ্রাস পায়। মানুষের মুখের কথা যে অপরকে এত শান্তি দিতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না। আমার জীবনে আমি এমন মধুময় চরিত্র আর দেখিনি।

দৈনন্দিন জীবনে মানুষ বিত্ত বিষয় যাহাই কামনা করুক, অন্তরের অন্তস্তলে কিন্তু সে দরদী মনের সান্নিধ্যকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দেয়। চরম দুর্দ্দিনে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া আনন্দমোহন সেদিন আমার স্ত্রীর মমত্ব ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন।

আনন্দমোহনের উপস্থিতি সকলেরই নিকট ছিল বহুবাঞ্ছিত। তিনি যখন আমাদের বাড়ীতে আসিতেন তখন আমার শিশু পুত্রকন্যারাও যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। আনন্দমোহন ট্রাউজার পরিতেন বলিয়া তাহারা তাঁহাকে সাহেব বলিত এবং এ সম্বোধনটি শুনিয়া তিনিও শিশুর মত আনন্দে উচ্ছ্বল হইয়া উঠিতেন।

আমার কন্যার মৃত্যুর অল্পকাল মধ্যে বন্ধুবরের গৃহেও এক বিষাদের ছায়া নামিয়া আসে। তাঁহার একটি পুত্র হঠাৎ পীড়িত হয় এবং অবশেষে তাহার মৃত্যু ঘটে। আনন্দমুখর পরিবারটি এ নিদারুণ শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। আমার দুঃখের দিনে বন্ধুর যে স্নেহমধুর স্পর্শ পাইয়াছি তাহা যেন আবার নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলাম। প্রতিদিন তাঁহার গৃহে যাইতাম ঠিকই, কিন্তু কোন সান্ত্বনা বাক্যই যেন মুখ হইতে বাহির হইত না। বন্ধুর স্ত্রী পুত্রশোকে কাতর হইয়া পড়িলেন। এই চরম দুঃখের পটভূমিকায় আনন্দমোহনের ভক্তিরস-সিক্ত যে মনটির পরিচয় পাইলাম ইতিপূর্ব্বে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকিয়াও তাহার আভাস পাই নাই। পুত্র শোকের আঘাতে তাঁহার ভগবৎ-সমর্পিত চিত্তটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। পুত্রশোক তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে নাই বরং সে আঘাত তাঁহার চরিত্রের সুপ্ত ভগবৎ-প্রেম পূর্ণতা লাভ করে। সে সময়ে প্রতিদিন তাঁহার গৃহে যাইতাম, দেখিতাম বন্ধুবরের অন্তরের মাঝে কি গভীর শান্তি—কি অতলস্পর্শী ভক্তি!

পুত্রের মৃত্যু শুধু আনন্দমোহনের আধ্যাত্ম-চেতনার দ্বারই উন্মোচন করে

নাই, সেই সঙ্গে উহা আমাদের সম্মুখে একটি নূতন আদর্শও স্থাপন করিল। সে সময়কার একদিনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়িলে আজিও আমার মন এক অপূর্ব্ব অনুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আনন্দমোহনের গৃহে গিয়া দেখিলাম তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া বসিয়া আছেন। ভাবিলাম, উন্মুক্ত বাতাসে মনের রুদ্ধ বাষ্প হয়ত কিছুটা অপসৃত হইবে। তাঁহার গৃহ হইতে গঙ্গা খুবই নিকটে। স্বামী স্ত্রীকে লইয়া আমি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম।

নির্জ্জন তটভূমিতে দাঁড়াইবার অল্পক্ষণ পরেই বন্ধুপত্নী শোকে অধীর হইয়া উঠিলেন। কি করা উচিত ভাবিয়া পাইতেছি না—হঠাৎ বন্ধুবরের মুখের দিকে তাকাইয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। প্রাতঃকালীন সূর্য্যালোক গঙ্গাবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার চক্ষু দুইটি গঙ্গাবক্ষে নিবদ্ধ, দৃষ্টি স্থির—মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব ভাবমণ্ডিত। তিনি যেন এক অন্য জগতের মানুষ। আমাদের পরিচিত আনন্দমোহনকে আবৃত করিয়া এক উর্দ্ধলোকচারী সত্তা যেন সেখানে বিরাজমান—তাঁহার বাহ্যজ্ঞানও তখন যেন লোপ পাইয়াছে। মনে হইল নিকটে থাকিয়াও তিনি বহু দূরের মানুষ। আমি বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ এভাবে অতিবাহিত হইবার পর আনন্দমোহন শোকসন্তপ্তা পত্নীর নিকট অগ্রসর হইয়া আসিলেন। একত্রে তিনজনে একটি বৃক্ষতলে বসিলাম। স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি শান্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন - দেখ, মনে কোন ক্ষোভ রেখো না, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। আমরা সাংসারিক বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে গিয়ে বহু সময় দুঃখ ভোগ করি, সেই সঙ্গে দুঃখের অন্তরালবর্ত্তী পরম সত্যটিকে বিস্মৃত হই। সব সময় মনে রাখবে দুঃখ বা আঘাত অভিশাপ নয়, তা ভগবানের আশীর্ব্বাদ। আঘাত না পেলে কখনও ভগবদ্‌ভক্তি জাগে না। মহাপুরুষদের জীবন আলোচনা যদি কর দেখবে, প্রত্যেকের জীবনেই শোক, দুঃখ বা যে কোন মর্ম্মান্তিক আঘাতের মাধ্যমেই মহত্তর সত্তার অবতরণ ঘটেছে। ঈশ্বরের সৃষ্ট আঘাতের পেছনে সব সময়ই একটি কল্যাণের ইঙ্গিত থাকে। পরম প্রভুর করুণার ওপর আস্থা রেখে যদি তাঁর পায়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পার, তবে দেখবে সমস্ত দুঃখ আঘাত ভিন্নতর রূপ নিয়ে তোমার জীবনে দেখা দিয়েছে। চরম আঘাতের মধ্য দিয়ে এই সত্যটি আমার নিকট জগদীশ্বর উদ্ঘাটন করেছেন।

সান্ত্বনা দিতে আসিয়া আজ শোকসন্তপ্ত বন্ধুর মুখ হইতে যাহা শুনিলাম তাহার পর আর অধিক কিছু বলিবার ইচ্ছা মনে জাগিল না। ইহাও বুঝিলাম, ঈশ্বরের অনন্ত করুণা বর্ষণে তাঁহার জীবন সিক্ত হইয়াছে। এতদিন বন্ধু আনন্দমোহনকে সত্যনিষ্ঠ কর্ম্মী, অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও দরদী মানুষ

হিসাবে জানিতাম। কিন্তু সেদিনকার প্রভাতে উদার আকাশের নীচে বসিয়া তাঁহার যে সাধক-জীবনের পরিচয় পাইলাম তাহা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভুলিতে পারিব না।

কিছুদিন মুঙ্গেরে থাকিবার পর আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম, আনন্দমোহন স্ত্রীপুত্রদের সেখানে রাখিয়া নিজে ফিরিলেন। উহা ১৮৭৮ সাল। ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেনের কন্যার সহিত কুচবিহারের মহারাজার বিবাহকে উপলক্ষ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে আবার মতানৈক্য আরম্ভ হয় এবং ক্রমে তাহা গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আমি ও আনন্দমোহন দুইজনেই তখন সাধারণ সমাজের বিশিষ্ট সদস্য। সুতরাং এ আন্দোলনে আমরা অনিবার্য্যভাবে জড়াইয়া পড়ি।

আনন্দোমোহন তখন তাঁহার বাসায় একা বাস করিতেছেন। আমি অধিকাংশ সময়ই তাঁহার ওখানে থাকিতাম। ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেনের এই সমাজবিরুদ্ধ আচরণ যে তাঁহাকে কি গভীরভাবে আঘাত করে তাহা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। সমাজের মধ্যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে জটিল সমস্যা ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়, তাহা সমাধানের জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

একদিন রাত্রে আমি তাঁহার গৃহের একটি কক্ষে একখানি সোফাতে নিমীলিত নেত্রে শুইয়া আছি, আর তিনি আমার পাশে চিন্তাকুল চিত্তে পদচারণা করিতেছেন। হঠাৎ বুকের উপর একটি মৃদু স্পর্শে চক্ষু মেলিয়া দেখি, বন্ধুবর আমার শায়িত দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি যেন বলিতে উদ্‌গ্রীব। আমি চোখ মেলিতেই ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন—শিবনাথ বাবু, সমাজে আজ যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধানের পথ কি? সমাজের কর্ম্মী ও সভ্য হিসাবে এর একটি সুমীমাংসা করাতো আমাদের কর্ত্তব্য!

এই কয়টি কথার মধ্যেই তাঁহার ব্যথিত চিত্তের সুস্পষ্ট আভাস পাইলাম। এমন দরদী মানুষ আমার জীবনে আমি সত্যই বেশী দেখি নাই।

আনন্দমোহন কিন্তু আমাকে এ কথাগুলি বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। ইহার পর সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করিবার অনুরোধ জানাইয়া ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেনকে তিনি একখানি ব্যক্তিগত পত্র প্রেরণ করেন। কেশব সেন সে পত্র সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে লিখিত এ পত্রখানি পরবর্ত্তীকালে বন্ধুবরের মহৎ ও উদারচরিত্রের নিদর্শন হিসাবে গণ্য হইয়াছে।

কেশব সেনের নিকট পত্র প্রেরণের পর আশানুরূপ ফল না পাইয়া আনন্দমোহন কিন্তু ক্ষুব্ধ হন নাই। ইহার পরও তিনি তাঁহার গৃহে গমন করিয়া একটি সু-মীমাংসায় আসিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। তখন সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণচিন্তা তাঁহাকে এতই চিন্তিত করিয়াছিল

যে, ব্যক্তিগত প্রীতি-অপ্রীতির কোন প্রশ্ন তাঁহার মনে জাগে নাই। কেশববাবু কিন্তু প্রতিপক্ষের এত অনুরোধ সত্ত্বেও কৃতকর্ম্ম সম্পর্কে কোন মতামত ব্যক্ত করিলেন না।

১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী কলেজ ষ্ট্রীটস্থ নবপ্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন হলে কয়েক জন বন্ধু এই বিষয়টির মীমাংসার জন্য একটি সভা আহ্বান করেন। আমি তখন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন হলে অবস্থান করিতেছি। কোন্নগরের প্রবীণ ব্রাহ্ম সদস্য, শিবচন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে বিরুদ্ধ-বাদীদের সম্মিলিত প্রতিবাদস্বরূপ একখানি পত্র কেশববাবুর নিকট প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু এ সম্পর্কে একটি সমস্যাও দেখা দেয়। হাইকোর্টের উকিল ডি, এম, দাস ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশনের সেক্রেটারী ডি, এন, গাঙ্গুলী প্রশ্ন তুলিলেন—যদি কেশববাবু এই পত্রের দাবী অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা না করেন তখন আমাদের পরবর্ত্তী কাজ কি হবে? তখন কি আমরা আর একটি নতুন সমাজ গঠন করতে উদ্যোগী হব?

নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করিতেও তখন অধিকাংশ সভ্য অনিচ্ছুক। সুতরাং স্বাক্ষরিত পত্রে এ প্রস্তাবের উল্লেখ করিতে প্রায় কেহই সম্মত হইলেন না। সকলেই আশা করিতেছিলেন, এ পত্র প্রেরণের পর ঘটনাটির একটি মীমাংসা হইয়াই যাইবে। কিন্তু ডি, এম, দাস ও ডি, এন গাঙ্গুলী এই অনিশ্চয়তার মধ্যে কিছু করিতে রাজী নহেন। সুতরাং তাঁহারা পত্রে স্বাক্ষরও করিলেন না। পরে অবশ্য তাঁহারা মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছি। আনন্দমোহনের পত্রাঘাতে কেশব সেনের কি প্রতিক্রিয়া হইল বা না হইল তাহা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। আমি দেখাইতেছিলাম যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য দূর করিবার জন্য আমার বন্ধুবরের কি অপরিসীম ব্যাকুলতা ও উদ্বেগই না ছিল। আমরা এই আন্দোলনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম সত্য, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের গঠনমূলক পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা তখন খুব পরিষ্কার ছিল না। কিন্তু দেশবিদেশস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে আনন্দমোহনের এ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল।

সে সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা বা কার্য্যকরী সমিতির বৈঠক সবই আনন্দমোহনের গৃহে বসিত। দিবারাত্র উহার যেন বিরাম নাই। আমি তখন একযোগে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' ও 'তত্ত্ব কৌমুদী' নামে দুইখানি পত্রিকা সম্পাদনা করিতেছি। বিশেষ করিয়া যেদিন পত্রিকা দুইটি প্রকাশিত হইত তাহার পূর্ব্বদিন আমায় সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পত্রিকার কার্য্যালয়ে থাকিতে হইত। তবুও আমার ছুটি ছিল না। যত রাত্রিই হউক কর্ম্ম শেষে আনন্দমোহনের গৃহে আমায় যাইতেই হইত। কোন কারণে একদিন

অনুপস্থিত হইলেই তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন।

একদিন সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর আনন্দমোহনের গৃহে গিয়াছি। সমাজের সভ্যেরাও অনেকেই উপস্থিত হইয়াছেন। আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি প্রায় বারোটা বাজিল। আমার তখন আর বসিয়া থাকিবার অবস্থা নাই। চলিয়া যাইবারই বা উপায় কই? লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, আলোচনা লইয়া প্রত্যেকেই এত উন্মত্ত যে আমার দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। আমি এই সুযোগ গ্রহণ করিলাম। চুপি চুপি চেয়ার হইতে সামনের টেবিলটির নীচে নামিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম। বলা বাহুল্য, ঘুম আসিতেও বিলম্ব ঘটিল না। আলোচনা কিন্তু পূর্ব্ববৎ চলিতেছিল।

হঠাৎ এক সময় আমার মতামত জানিতে সকলে ব্যগ্র হইলেন। তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, চেয়ার শূন্য—আমি নাই। হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সকলেই এদিক ওদিক খুঁজিতেছে হঠাৎ সকলকে চমকিত করিয়া আনন্দমোহন আমার দুই পা ধরিয়া টানিতে টানিতে আমাকে টেবিলের নীচ হইতে আবিষ্কার করিলেন। চিৎকারে আমারও নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। ততক্ষণে উচ্চহাস্যে ঘরখানি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আমার পা দুইটি তখনও আনন্দমোহনের হাতে। আমার অসহায় অবস্থার কথা জানাইলে হাসিতে হাসিতে তিনি আমার পাশে কার্পেটের উপর গড়াইয়া পড়িলেন। পরবর্ত্তীকালে প্রায়ই তিনি এ প্রসঙ্গ তুলিয়া আমায় উপহাস করিতেন।

সকল মানুষেরই অল্প বিস্তর ক্লান্তি থাকে কিন্তু আনন্দমোহনকে কখনও ক্লান্ত হইতে দেখি নাই। তাঁহার প্রাণপ্রাচুর্য্য অনেক সময়ই সহকর্ম্মীদের মনে ভীতির সঞ্চার করিত। কলিকাতায় সমাজের কার্য্যকরী সমিতির বৈঠক যেদিন বসিত সেদিন শহরতলী হইতে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারাই পড়িতেন বেশী বিপদে। বৈঠকের কার্য্যসূচী শেষ হইলেও আলাপ আলোচনায় আনন্দমোহন সকলকে আটকাইয়া রাখিতেন। কেহ যাইবার জন্য চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলে অমনি ক্ষিপ্রপদে তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন—মশাই, আপনি একাই বুঝি বাড়ী যাবেন? একটু পরে তো সকলেই যাচ্ছে,-এত তাড়া কিসের?—কিন্তু এই 'একটু পরে' কোন সময়ই দুই এক ঘণ্টার পূর্ব্বে দেখা দিত না।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে দুইটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া আমি ও আনন্দমোহন বসু একত্রে সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করি। নূতন সমাজ-গঠনের কার্য্যে তখন কয়েকজন দক্ষ কর্ম্মীর বিশেষ আবশ্যক। আমরা ভাবিলাম, এই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া কয়েকজন একনিষ্ঠ ব্রাহ্ম শিক্ষক নিশ্চয়ই এখানে জড় হইবেন। আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ব্রাহ্মধর্ম্ম নির্দ্দেশিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারাপুষ্ট একটি ছাত্রগোষ্ঠী গঠিত হউক,

ইহা আমাদের কাম্য ছিল।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি স্বেচ্ছায় আমাদের এ কর্ম্মপ্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেন। তিনজনের নাম স্বাক্ষরিত নিয়মাবলীপত্র প্রকাশিত হইল। আনন্দমোহন বিদ্যালয়ের আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন, সুরেন্দ্রবাবু শিক্ষকতা করিতে সম্মত হইলেন এবং আমি এই বিদ্যালয় কমিটির সেক্রেটারীরূপে সংগঠন কার্য্যের দায়িত্ব লইলাম।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েকমাসের মধ্যেই 'ষ্টুডেণ্টস উইকলী সার্ভিস' স্থাপিত হইল। এই প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে একদিন করিয়া প্রার্থনা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। বলা বাহুল্য, এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ কাজের ভারই আমাদের উভয়ের উপর আসিয়া পড়ে। সুতরাং প্রতিদিনই তাহার সহিত দীর্ঘ আলাপ আলোচনা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। কাজকর্ম্ম শেষ করিতে করিতে এক একদিন অধিক রাত্রি হওয়ায় বাধ্য হইয়া আমাকে তাঁহার গৃহেই রাত্রি যাপন করিতে হইত।

একদিনের কথা মনে পড়ে। সেদিন বেশী রাত্রি হওয়ায় আনন্দমোহনের গৃহেই আহার করিলাম। অতঃপর দুইজনে তাঁহার পাঠকক্ষে বসিয়া আলোচনায় মগ্ন হইয়া গেলাম। ঘড়িতে কয়টা বাজিয়া গেল সেদিকে কারুরই কোন খেয়াল নাই। হঠাৎ পাশের দরজা ঠেলিয়া বন্ধুপত্নী আবির্ভূত হইলেন, উভয়েই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। তাঁহার বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে নিজেদের অপরাধী বোধ না করিয়া পারিলাম না। তিনি আমাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—কটা বেজেছে খেয়াল আছে কি? ঘড়িতে কয়টা বাজে বলতো?

আনন্দমোহন উচ্চহাস্যে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—আমরা কিন্তু বাজে কাজ কচ্ছিনে, খুব প্রয়োজনীয় আলোচনাই হচ্ছিল।

হাস্য পরিহাসের মধ্যে আমরা আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইলাম ও অবশিষ্ট রাত্রি দুইজনে একত্রে শয়ন করিয়া কাটাইলাম।

আইনব্যবসায় আনন্দমোহনের উপজীবিকা। কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্মটি সম্পর্কেই তাঁহার ঔদাসীন্য ছিল যেন সর্ব্বাধিক। অনেকে বলাবলি করিতেন, উনি তো অন্য কাজেই সকল সময় ব্যয় করেন, নিজের কাজ করেন কখন? সত্য কথা বলিতে কি, এ প্রশ্ন মাঝে মাঝে আমার মনেও জাগিত। তাঁহার এটর্ণী অনেকদিন সখেদে আমাকে বলিয়াছেন—আনন্দবাবু যদি ব্যবসায়ে একটু মন দিতেন তাহলে তিনি বার-এ অদ্বিতীয় হতেন, সন্দেহ নেই।

কিন্তু ভগবান আনন্দমোহনকে হিসাবী জীবনযাপনের জন্য পাঠান নাই। অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্য্যে তিনি সব সময়ই গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেন। নিজের কাজ সম্পর্কে মনোযোগ দিবার কথা বলিলেই

হাসিয়া বলিতেন—বাবা ! আইনের কাগজপত্রগুলোকে আমি যেন সাপের মত ভয় করি। ওগুলো দেখলেই অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়।

কিন্তু অসামান্য প্রতিভার অধিকারী করিয়া ভগবান যাঁহাদের এ পৃথিবীতে পাঠান, জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তাঁহারা ব্যর্থকাম হন না। আনন্দমোহনের বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আইনব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবার কোন চেষ্টা না করিয়াও তিনি আইনজ্ঞ হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন।

উচ্চশিক্ষার্থে আনন্দমোহন যখন ইংলন্ডে গমন করেন সে সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা বিলাতের পার্লামেণ্টে ভারতীয়দের ন্যায্য দাবীর অধিকার জানাইয়া আন্দোলন করিতেছেন। রাজনীতিবিদ্ হিসাবে আনন্দমোহনের সে সময়ে যথেষ্ট সুনাম ছিল এবং তৎকালীন নেতারা তাঁহার প্রস্তাব ও উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেন। জাতীয় আন্দোলনকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে বিদেশী রাজনীতির ধারাটি সম্যকভাবে বুঝা প্রয়োজন। তাই আনন্দমোহন কিছুদিন ইংলন্ডে বাস করিবার ইচ্ছা আমাদের জানান। আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতাই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে ও আমাদের সকলকে এ সংকল্প ত্যাগ করাইতে বাধ্য করে।

ঐশী বিধানে যাঁহারা অফুরন্ত প্রাণশক্তি লইয়া এই পৃথিবীর মাটিতে জন্ম গ্রহণ করেন, সীমাবদ্ধ জীবনের খ্যাতি প্রতিপত্তি, সম্পদের মোহ তাঁহাদের আকৃষ্ট করিতে পারে না। আনন্দমোহনের জীবনে ইহাই দেখা গিয়াছিল। মহত্তর জীবনের বীজ লইয়া তিনি আসিয়াছেন, হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করিয়া অর্থ ও যশ লাভ করিয়া তাঁহার তাই তৃপ্তি কই ? সে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের কর্ম্ম ও চিন্তাকে তিনি অত্যন্ত ভয় পাইতেন। কিন্তু যখনই তিনি কোন বৃহত্তর কর্ম্মে অংশ গ্রহণ করিতেন তখনই তাঁহার মধ্যে যেন এক অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত হইত। দেশের ও দশের কাজকে তিনি প্রকৃত কর্ম্মের আখ্যা দিতেন এবং তাহা করিতেই উৎসাহবোধ করিতেন। তাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে, ফেডারেশন গ্রাউন্ডের উদ্বোধনী বক্তৃতায় আনন্দমোহনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা যেমন বলিষ্ঠ তেমনি মহৎ। সে ভাষণের উদাত্ত সুর যে কোন ব্যক্তির চিত্তকেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম।

দেশে ফিরিয়া আনন্দমোহন শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে মনোনিবেশ করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত সিটি স্কুলটিকে কলেজে রূপান্তরিত করিবার মত কোন পরিকল্পনা আমার মনে না থাকিলেও বন্ধুবর কিন্তু তাঁহার প্রবল ইচ্ছার স্রোতে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বিদ্যালয়টিকে কলেজে পরিণত করিয়া পুণা ফারগুসান কলেজের মত একটি বিশ্বভ্রাতৃত্বে উদ্বুদ্ধ কর্ম্মপরিষদের হস্তে সমর্পণ করা। কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাবটি কলেজের অন্যান্য কর্ম্মীবৃন্দ

ও ব্রাহ্ম বন্ধুবান্ধবগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। অনেকে কঠোরভাবে ইহার সমালোচনাও করেন। এই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া আনন্দমোহনকে বড়ই-কঠিন আঘাত পাইতে হয় কিন্তু ইহাতে তিনি কোনদিনই বিচলিত হন নাই। বন্ধুবর মহান আদর্শের উপরই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সুচারুরূপে উহা পরিচালনা করার উদ্দেশে কয়েকজন সদাশয় ব্যক্তিদ্বারা গঠিত একটি ট্রাষ্টের উপর ভার অর্পণ করেন।

মানুষের চরিত্রে যে সব গুণের সমাবেশ ঘটিলে তাহাকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী বলিয়া বলা যায় আনন্দমোহনের জীবনে সেগুলির অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। আমার বন্ধু বলিয়াই যে এ প্রশংসা করিতেছি তাহা নয়, সত্যই তাঁহার চরিত্রের পরিপূর্ণতা আমাকে বিস্মিত করিয়া দিত।

অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই দুইটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব দেখা যায়—একটি নিজস্ব অন্তর্মুখীন ব্যক্তিত্ব, অপরটি তাহার বহিরঙ্গ ব্যক্তিত্ব। দ্বিতীয়টির প্রভাবেই মানুষ অপরের চক্ষে নিজেকে মহৎ, সৎ ও বিরাট প্রতিপন্ন করিতে চায়। কিন্তু আনন্দমোহনের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে দীর্ঘ দিন বাস করিয়াও তাঁহার মধ্যে কখনও এই দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের আভাস পাই নাই। স্বভাবতঃ তিনি ছিলেন ধার্ম্মিক, দরদী, ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু ও বিনয়ী। কিন্তু নিজের চরিত্রের এই মহত্তর গুণগুলিকে অন্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার কোন প্রয়াসই তাঁহার মধ্যে দেখি নাই, বরং তাঁহার প্রতিটি আচরণেই তিনি নিজের মহত্ত্বকে অন্যের চক্ষের অন্তরালে রাখিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

আনন্দমোহনের চরিত্রের আধ্যাত্মিক ধারাটিও নিঃশব্দ-সঞ্চারী ছিল। তাঁহার কর্ম্মমুখর জীবনের সহিত অধ্যাত্ম-জীবনটিও যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সে সংবাদ খুব কম লোকই জানেন। বন্ধুবর পাঠকক্ষে দিনের পর দিন দীর্ঘ সময় অধ্যাত্মসাধনায় মগ্ন থাকিতেন, কিন্তু ইহার কোন বাহ্যিক প্রকাশ দেখা যাইত না।—তাঁহার অতি নিকট আত্মীয় বন্ধুরা জানিতেন যে, তিনি জরুরী কাগজপত্র লইয়াই ব্যস্ত আছেন।

আনন্দমোহন কর্ম্মপ্রিয় ও কর্ম্মপাগল ছিলেন ঠিকই, কিন্তু শত কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে নিজেকে মুক্ত করিয়া শহর হইতে দূরান্তরে চলিয়া যাইতেন। তাঁহার এই আচরণ সকলকেই অল্প-বিস্তর কৌতূহলী করিয়া তুলিত। উত্তরজীবনে জানিয়াছিলাম, বন্ধুবর কর্ম্ম হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়া সে সময় অধ্যাত্মসাধনায় অতিবাহিত করিতেন।

কর্ম্মহীন, সঙ্গীহীন নিরবচ্ছিন্ন অবকাশটি তিনি ধ্যান ধারণা, উপাসনা ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠেই অতিবাহিত করিতেন। অবশ্য এই নিরবচ্ছিন্ন অবসরটুকুই যে শুধু তাঁহার অধ্যাত্ম-অনুশীলনের প্রকৃষ্ট কাল ছিল একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহার লিখিত ডায়েরী হইতে জানা যায়, অত্যন্ত কর্ম্মমুখর

ক্ষণেও তাঁহার মন পরমেশ্বরের চিন্তায় মগ্ন থাকিত। কর্ম্ম তাঁহার চিত্তকে মুহূর্ত্তের জন্যও ঈশ্বর-চিন্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। এই অভ্যাস-যোগের ফলে ভিন্নমুখী কর্ম্মের মধ্যেও ভগবৎ-রসাস্বাদনে তাঁহার বাধা হইত না। সমস্ত ডায়েরীটির মধ্যে পরমপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার আন্তরিক ব্যাকুলতা যে কোন জড়বাদী আধুনিক মানুষের অন্তরে স্পন্দন জাগাইয়া তুলে। পরবর্ত্তী-কালে তাঁহার সমগ্র চিত্তটি যে অধ্যাত্মসাধনালব্ধ আলোকপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহারও বহু নিদর্শন এই ডায়েরীতে রহিয়াছে। এমন কি, জীবনের শেষভাগে বন্ধুবর আনন্দমোহন দৈনন্দিন জীবনেও ঐশী প্রেরণা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

একটি দিনের ঘটনা মনে পড়ে—সেদিন বোধ হয় রবিবার। পূর্ব্বদিন রাত্রেই তিনি নিজের জন্য সাত্ত্বিক ধরণের আহার্য্য প্রস্তুত করিতে স্ত্রীকে বলেন এবং নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে যেন কেহ তাঁহাকে বিরক্ত না করে, সে নির্দ্দেশও দেন। রবিবার অতি প্রত্যুষেই তিনি পাঠকক্ষে অধ্যয়নরত হন। নির্দ্দেশিত সময়ে ভৃত্যের হস্তে চা পাঠাইয়া দেওয়া হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তাহার স্ত্রী পুনরায় আর এক পেয়ালা চা লইয়া তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখেন, পূর্ব্ব-প্রেরিত চায়ের পেয়ালাটি সেই অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং আনন্দমোহন গভীর মনোযোগ সহকারে স্তূপীকৃত কাগজপত্র ও পুস্তকমধ্যে নিমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার পাঠে বিঘ্ন না ঘটাইয়া তাঁহার স্ত্রী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসেন, ক্রমে প্রাতরাশের সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। তথাপি আনন্দ-মোহনের কোন সাড়া শব্দ নাই। ভৃত্য ডাকিতে গিয়া বারবার ফিরিয়া আসে ও জানায়—বাবু এক্ষুণি আসিতেছেন। কিন্তু 'এক্ষুণি' বহুক্ষণে পরিণত হইতে চলিল। তাঁহার পত্নীও দুইবার একই মন্তব্য শুনিয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরিবারস্থ ব্যক্তিদের হতাশ হইয়া বসিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর রহিল না।

বেলা প্রায় দুইটার সময় একটি জরুরী কর্ম্মে আমি তাঁহাদের বাড়ী গিয়া সকলকে হতাশ হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখি। বন্ধুপত্নীর নিকট সমস্ত শুনিলাম এবং তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া আমার বড় মমতার সঞ্চার হইল। সোজা বন্ধুবরের পাঠকক্ষে প্রবেশ করিলাম ও কিছু প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়াই তাঁহার হাত দুইটি ধরিয়া একরকম জোর করিয়াই আহারের টেবিলে টানিয়া আনিলাম।

জীবনের শেষাংশে আনন্দমোহনের অধ্যাত্ম-আবেগ স্পষ্টতররূপে বৃদ্ধি পায়। তিনি মাঝে মাঝেই তাঁহার দমদমের নির্জ্জন গৃহে বসবাস করিতেন। এই সময়ে শুধু একটি ভৃত্য তাঁহার নিকট থাকিত, আনন্দমোহনের নির্জ্জনবাসের পক্ষে সে খুবই সহায়ক ছিল। কারণ বাবু কক্ষে বসিয়া একবার ধ্যানমগ্ন হইলে দীর্ঘকালের মধ্যে উঠিবার সম্ভাবনা থাকিত না এবং ভৃত্যকে ডাকিবারও

প্রয়োজন হইত না, একথা চিন্তা করিয়াই সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। ভৃত্যটির এই কর্ম্মবিমুখতা আনন্দমোহনের পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক হইয়াছিল।

আনন্দমোহন এত বিনয়ী ছিলেন যে, অপরের সম্মুখে ত দূরেই কথা স্ত্রী পুত্রের সম্মুখেও উপাসনাবাণী পাঠ করিতে লজ্জিত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্ম সম্পর্কে তাঁহার ঔদাসীন্য ছিল একথা যেন কেহ মনে না করেন। আমি যখন প্রত্যেক গৃহে পারিবারিক যৌথ প্রার্থনার আন্দোলন করি সে সময় আনন্দমোহন ছিলেন ইহার বড় সমর্থক। তিনি বলিতেন, প্রত্যেক গৃহে একখানি প্রার্থনাগ্রন্থ থাকা আবশ্যক, তাহা হইলে প্রত্যেকে কিছু কিছু করিয়া উহা পাঠক করিতে পারে। ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনাকালে লক্ষ্য করিয়াছি, আনন্দমোহন যুক্তকরে সাশ্রুনেত্রে অকম্পিত দেহে নিজ আসনে সমাসীন। কোন কোন দিন প্রার্থনাবাণী শুনিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হইতেন যে প্রার্থনা শেষে ভাববিহ্বল চিত্তে আমায় জড়াইয়া ধরিতেন।

আনন্দমোহনের কর্ম্মমুখর জীবনে আত্ম-প্রচার ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার সহিত একান্তে কথাবার্ত্তার মধ্যে তাঁহার মনের দুয়ার খুলিয়া যাইত। একদিন আমি তাঁহার অনলস কর্ম্ম সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেছি। আনন্দমোহন আমার হাত দুইখানি তাঁহার মুঠার মধ্যে ধরিয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—শিবনাথবাবু, সকলে আমার কর্ম্মের প্রশংসা করে আমায় লজ্জা দেয়, কিন্তু তারা তো জানে না যে আমি ঈশ্বরসৃষ্ট পৃথিবীর কল্যাণে আত্মনিবেদিত এবং তাঁরই করুণায় মানুষের মাধ্যমে তাঁর সেবা করেই আমি কৃতকৃতার্থ হচ্ছি। আমি যে আমার নিজের তাগিদেই কর্ম্ম করি।

সেদিন আমি তাঁহার সর্ব্বসমর্পিত চিত্তের পরিচয় পাইয়া সত্যই বন্ধুগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

এতক্ষণ আমি কেবলমাত্র বন্ধুর ভক্তিরসসিক্ত মনের সম্পর্কেই জানাইয়াছি। কিন্তু চরিত্রের এ কোমলতার সহিত যে তেজস্বিতা ও স্বাদেশিকতার সংমিশ্রণ তাঁহার মধ্যে ঘটিয়াছিল তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে স্বজাতির ন্যায্য দাবী উত্থাপিত করিয়া দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ যে বক্তৃতা তিনি দেন, তাহা শুনিতে গিয়া আনন্দমোহনের এক নূতন পরিচয় পাইলাম। সে পরিচয় আত্মনিবেদিত ভক্তিরসাপ্লুত সাধকের নয়, এক নির্ভীক তেজস্বী দেশসেবকের মূর্ত্তি সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমি যে সময় বাঙ্গলার কোলে জন্ম লইয়া বাড়িয়া উঠি তখন বঙ্গমাতার কৃতী সন্তানদের কীর্ত্তিপ্রভায় দেশ উদ্ভাসিত। তাই বহু প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিবার সৌভাগ্য তখন আমার হইয়াছিল। সেই সকল প্রতিভাবান বঙ্গসন্তানদের সহিত পরম সুহৃদ, কর্ম্মযোগী আনন্দমোহনের

স্মৃতিটি আমার মনোলোকে উজ্জ্বল হইয়া আছে। কোমল ও কঠোর, ত্যাগ ও ভক্তি সমন্বিত সে অপূর্ব চরিত্র দেশবাসীর চিত্তে স্থায়ী আসনলাভ না করিয়া পারিবে না। তাঁহার মহান চরিত্রের কিছুটা অংশ আমার অস্পষ্ট জীবনস্মৃতি হইতে চয়ন করিয়া আজ নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

রামকৃষ্ণ পরমহংস

তখন ১৮৭৫ সাল। আমি সে সময় ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ঘটনাচক্রে আমার সহিত লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের সৌহার্দ্দ্য জন্মে। তাঁহার শ্বশুরালয় ছিল কলিকাতার উপকণ্ঠে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বরে। একবার তিনি দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন—শিবনাথ বাবু, দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীমন্দিরে একটি অতি শক্তিমান্ সাধক অবস্থান কচ্ছেন; তাঁর সাধনা, চালচলন, কথাবার্ত্তা সব কিছুই বড় আকর্ষণীয়।

তিনি আমায় রামকৃষ্ণের কয়েকটি বাণীও শুনাইলেন। সহজ, সরল ও বহুশ্রুত, কিন্তু তবু যেন এগুলি আমায় বেশ উচ্চকিত করিয়া তুলিল। বহু কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও মনে সেই কথাগুলির অনুরণন চলিতে লাগিল, কেমন যেন একটা অদৃশ্য আকর্ষণও অনুভব করিতে লাগিলাম। অবশেষে একদিন বন্ধুবরকে সঙ্গে লইয়া সেই অখ্যাত পল্লীগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

তখনও শক্তিসাধক পরমহংসের অলৌকিক শক্তির সংবাদ কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে বিশেষ পেঁছায় নাই। পরবর্ত্তীকালে ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেন নিয়মিত ভাবে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং তিনি পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণ তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহার ফলে দেশবাসী এই সাধক সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠেন।

প্রথম পরিচয়ের পর হইতে তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত বহুবার আমি শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। দর্শনের নির্দ্দিষ্ট সময় অথবা প্রতিবার সাক্ষাৎকালীন যে সব কথাবার্ত্তা আমাদের মধ্যে হয়, তাহা বিস্তারিত ভাবে মনে নাই, তবে উহার সারাংশ স্মরণে রহিয়াছে। আজ আমার সেই পুরাতন স্মৃতিভাণ্ডার হইতে তাহা এখানে বিবৃত করিব।

আজিও আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে, প্রথম যেদিন তাঁহাকে দেখিতে যাই সেদিন আমায় দেখিয়া তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং অতি পরিচিতের মতই আমায় গ্রহণ করেন। আমি ভাবিলাম—সঙ্গী বন্ধুটি বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই আমার সম্পর্কে সাধককে নানা কথা শুনাইয়া রাখিয়াছেন, সেজন্যই তিনি এরূপভাবে আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। এইদিন তাঁহার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিল, সেটি হইতেছে তাঁহার অপূর্ব্ব সরলতা। তিনি আমার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া শিশু-সুলভ সরলতা ও ব্যাকুলতা লইয়া বারবার বলিতে লাগিলেন—তোমায় দেখে আজ আমার বড় আনন্দ হ'লো। কিগো, মাঝে মাঝে এখানে আসবে তো?

মন্দির পার্শ্বস্থ অধিবাসীদের নিকট এই সাধকের জীবন-বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে জানিলাম, ইনি একজন নিরক্ষর দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রাণী রাসমণির কালীমন্দিরের পূজারীরূপে দক্ষিণেশ্বরে সর্ব্বপ্রথম আসেন কিন্তু নিজের অসাধারণ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কঠোর তপস্যাবলে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার লাভ করেন। প্রতিবেশীরা আরও বলে যে, নরদেহে এরূপ শক্তির প্রকাশ নাকি খুব অল্পই ঘটিয়া থাকে।

ইহার পর মাঝে মাঝেই তাঁহার নিকট যাইতে থাকি এবং এই যাতায়াতের ফলে আমাদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই সময় তাঁহার নিজের মুখ হইতে যে সকল ঘটনা শুনি তাহাই এখানে বর্ণনা করিতেছি। তিনি বলেন— পূজারী হইয়া যখন এই মন্দিরে বাস করিতেন তখন তিনি বহু মহাপুরুষ ও সাধুসন্তের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য লাভ করেন। তাহার কারণ, সে সময় সাধু-সন্ন্যাসীরা পুরী বা জগন্নাথ দর্শনের পথে এই মন্দির দর্শন করিতে আসিতেন এবং অনেকে আবার কয়েক দিনের জন্য এখানে অবস্থানও করিতেন। এই সকল সিদ্ধ সাধকগণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য রামকৃষ্ণের জীবনে এক বিরাট পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। শিশুকাল হইতে স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার ভিতর অধ্যাত্মতৃষ্ণা প্রবল ছিল। বর্ত্তমান পরিবেশ উহাকে আরও তীব্রতর করিয়া তুলে। ফলে সমগ্র মন প্রাণ ভগবানে সমর্পণ করিয়া পরম প্রাপ্তির জন্য তিনি কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বাণী ছিল—কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ। তিনি মুমুক্ষুদের বলিতেন, অধ্যাত্মসাধনার পথে কামিনী কাঞ্চনকে বিষবৎ ত্যাগ করিতে হয়। তিনি কিভাবে নিজ জীবনে এই বোধটি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন, তাহার বর্ণনা আমাকে চমৎকৃত করে। তিনি বলেন যে, সাধক জীবনে কাঞ্চন সম্পর্কে আসক্তি ত্যাগ করিবার বাসনায় তিনি এক হস্তে কিছু ধূলি ও অপর হস্তে কয়েকটি মুদ্রা লইয়া গঙ্গার তীরে গিয়া বসিতেন এবং ধূলি ও মুদ্রা এই দুইটি বস্তুই যে মূলত এক বস্তু ছাড়া আর কিছুই নহে এইটি বোধ করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সময় তাঁহার মুখে ক্রমাগত উচ্চারিত হইত— মাটি টাকা, টাকা মাটি। একাগ্র মননশীলতার বলে যখন দুইটি বস্তুই তাঁহার নিকট একাকার বলিয়া প্রতীয়মান হইত তখন ধূলি ও মুদ্রা দুই-ই অবলীলায় তিনি গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিতেন।

কামিনীর সঙ্গ ত্যাগ সম্বন্ধেও তাঁহার প্রচেষ্টা কম চমকপ্রদ নয়। এই স্বল্প পরিসর স্থানে সমস্ত ঘটনার বিবৃতি সম্ভব নয়। তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাধন-জীবনে সিদ্ধিলাভের পরও কোন নারীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তিনি আসিতে পারিতেন না। কোন ভক্ত শিষ্যা তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলে তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিতেন—ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওখান থেকে প্রণাম করলেই চলবে, মা। আর কাছে এগিয়ে আসবার

প্রয়োজন নেই।

নারীদের সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের এই মনোভাব সম্বন্ধে আমার একটি বিশেষ কৌতূহল ছিল। আমি একদিন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম—আচ্ছা, মহিলারা আপনার চরণ স্পর্শ করতে এলে আপনি এমন ব্যস্ত হয়ে উঠে তাঁদের নিরস্ত করেন কেন?

সাধক প্রবর আমায় উত্তর দিলেন—কামিনী ও কাঞ্চন এ দুইটি বস্তু স্পর্শ করিবার তাঁহার উপায় নাই। ইহাদের স্পর্শমাত্রই তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়েন। আমার সম্মুখে আমি কোন মহিলাকে তাঁহার দেহ স্পর্শ করিতে দেখি নাই, কিন্তু কাঞ্চনের প্রতিক্রিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছি। একদিন একটি কৌতূহলী ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের সত্যতা পরীক্ষার্থে তাঁহার হস্তে হঠাৎ একটী মুদ্রা স্থাপন করে। আমি তখন তাঁহার কক্ষেই উপবিষ্ট। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, মুদ্রাটি যেন তাঁহার দেহে তড়িত-প্রবাহের কাজ করিল। সেই মুহূর্তে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং যতক্ষণ না মুদ্রাটি তাঁহার হস্ত হইতে উঠাইয়া লওয়া হইল ততক্ষণ সে দেহে চেতনার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

সেদিন বুঝিলাম, বৈরাগ্য তাঁহার সমগ্র চেতনায় একেবারে ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছে।

কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপেই গণ্য হইত। তিনি স্বয়ং এই নিয়ম পালন সম্বন্ধে সব সময়েই অত্যন্ত সচেতন থাকিতেন। আমার সহিত যখন তাঁহার প্রথম পরিচয় হয় সে সময় রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সহধর্ম্মিণী সারদা দেবীর বস্তুতঃ কোন ব্যবহারিক সম্পর্ক ছিল না। বালিকা সারদা দেবী গ্রামের বাড়ীতে বাস করিতেন। পত্নী সম্পর্কে তাঁহার এরূপ উদাসীনতাকে আমি সে সময় মোটেই সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইতে পারি নাই বরং স্ত্রীর প্রতি অকর্ত্তব্যের অভিযোগই সেদিন উঠাইয়াছিলাম।

একদিন আমি দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার কক্ষে উপস্থিত। আমার কয়েকজন বন্ধুর সম্মুখে পরমহংসের দাম্পত্য জীবনের কর্ত্তব্যচ্যুতি সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি। সাধক কিন্তু আমাদের পার্শ্বেই উপবিষ্ট। আমার অভিযোগপূর্ণ উক্তি শুনিয়া তিনি আমাকে তাঁহার নিকটে ডাকিয়া কাণের নিকট মুখ লইয়া বলিলেন—তুমি শুধু শুধু এ নিয়ে কেন আন্দোলন ক'রছো। আমার দ্বারা জৈব জীবন যাপন যে আর সম্ভব নয়।

নিজের দেহের প্রতি অঙ্গুলি সংকেতে বলিলেন—এ দেহ থেকে জীব-জীবনের কামনা ও বাসনার মূল উৎপাটিত হয়ে গিয়েছে।—তাঁহার এ উক্তির সত্যিকার তাৎপর্য্য কিন্তু বুঝি নাই।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে পুনরায় রামকৃষ্ণের উপদিষ্ট কামিনীকাঞ্চন

ত্যাগের অযৌক্তিকতা লইয়া আমার সাথে বিতর্ক হয়। প্রসঙ্গতঃ আমি বলিলাম —আপনি ধর্ম্ম জীবন থেকে নারী বর্জনের যে নীতি নির্দ্ধারণ করেছেন তা অনুচিত। ব্রাহ্ম সমাজ কিন্তু তা করেনি। ব্রাহ্মধর্ম্মে নারী শিক্ষা, নারী প্রগতি, সমাজে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান সম্বন্ধে আন্দোলন চলছে। মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্র থেকে নারীসঙ্গ পরিহারের নীতি কোন ক্রমেই গ্রহণীয় হতে পারে না।

তাঁহার নির্দ্দেশিত পথ সম্পর্কে অভিযোগ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থা শুনিয়া পরমহংস তো উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই শিশু সুলভ ক্রোধের রূপটি আমায় বড় আনন্দ দিত, কারণ, সে ক্রোধে তীব্রতা ছিল কিন্তু তিক্ততা ছিল না। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—মূর্খের দল! এই নারীরাই তোমাদের জন্য সর্ব্বনাশা গর্ত্ত খুঁড়ে রাখছে।

কথা বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তারপর উজ্জ্বল তীক্ষ্ন দৃষ্টিটি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন—আচ্ছা একজন মালীর কথাই ধর। যখন সে তার বাগানে ফুল গাছের চারা পোঁতে, তখন গরু ছাগলের হাত থেকে ওটাকে রক্ষা করার জন্য কি সে আবার বেড়া দেয় না? শিশু গাছটি যখন বড় হয়ে ওঠে, তখন মালী নিজেই সে বেড়া খুলে ফেলে দেয়।

আমি বলিলাম—আপনার কথা যথার্থ, কিন্তু ওটা তো মালীর বৃক্ষরোপণের কথা মাত্র। মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে তার যৌক্তিকতা কোথায়?

—মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কেও সেই একই নিয়ম খাটে। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম ভাগে নারীসঙ্গ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ কর। মনকে একান্তভাবে ঈশ্বরে সমর্পণ করে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন কর ও আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হও, তারপর নারীদের সাথে মেলামেশা কর। তার পূর্ব্বে নয়।

কথায় বাধা দিয়া আমি অসহিষ্ণুভাবে বলিলাম—আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রে নারী জাতি গরু ছাগলের মত হেয় এবং অহিতকারী সঙ্গী বলে আপনি যে উপমাটি আজ দিলেন তা আমি মানতে কিছুতেই সম্মত নই, বরং আমি একথাই বলবো যে, নারীজাতি আমাদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে অপরিহার্য্য সঙ্গিনী ও সহায়িকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ আমার যুক্তি সমর্থন করিলেন না। শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—এ ধারণা ভ্রান্ত।

আলাপ আলোচনায় সেদিন সন্ধ্যা হইয়া গেল। পশ্চিমাকাশের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি সকৌতুকে বলিয়া উঠিলেন—কি গো! সন্ধ্যে তো হয় তাড়াতাড়ি ঘরপোষা জীব ঘরে ফিরে যাও, নইলে গিন্নী আবার ঘরে ঢুকতে দেবে না।

মহাপুরুষের সেই সরল অনাবিল রসিকতায় উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলেই হাসিয়া উঠিলেন।

কেবল নারী সম্পর্কেই নহে, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার অন্যান্য পন্থাগুলিও বড় বিচিত্র ছিল। তিনি নিজে ছিলেন ধর্ম্ম-অন্ত-প্রাণ। ধর্ম্ম ব্যতীত জীবনে অন্য কোন কামনাই যে তাঁহার ছিল না—এসম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নাই। কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত রীতিনীতিগুলিকে আমি সময়ের অপব্যবহার বলিয়াই মনে করি। তাঁহার নিজ মুখ হইতেই শুনিয়াছি, যে, সে সময় দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সাধু সন্ন্যাসীর যাতায়াত ছিল। এ সন্ন্যাসীগণ নিজ নিজ আধ্যাত্মিক আদর্শ ও সাধনজীবনের অভিজ্ঞতা হইতে যে যে পন্থাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায়ক বলিয়া বলিতেন, বিশ্বাসবান রামকৃষ্ণ সেই ভাবকে অবলম্বন করিয়া তখনই সাধনা আরম্ভ করিয়া দিতেন।

একবার এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলেন যে, ঈশ্বরে পরিপূর্ণ নির্ভরতা আনিতে হইলে ভক্ত হনুমানের ভাব অবলম্বন বিশেষ কার্য্যকরী। রামায়ণে দেখা যায় হনুমানের জীবনে রাম ব্যতীত অন্য কোন চিন্তার স্থান নাই—পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনেই এই ভাব সম্ভব। একথা শুনিবামাত্র রামকৃষ্ণ হনুমানের ভাবে সাধনা আরম্ভ করিলেন। একাদিক্রমে কয়েকদিন তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন না। নিজের মধ্যে হনুমানের ভাবটি আরোপ করিলেন এবং ইহার পর তিনি সম্পূর্ণরূপে উক্ত ভাবে ভাবান্বিত হইয়া পড়িলেন। এ সময়ে হনুমানের মত একটি লেজ নিজ দেহে সংযোজন করিয়া কক্ষ মধ্যে লাফালাফি করিতেও ছাড়েন নাই। মুখে তখন তাঁহার শুধু এক কথা—ঈশ্বর, আমি তোমার একান্ত অনুগত ভৃত্য। আমায় তুমি কৃপা কর।

শ্রীরামকৃষ্ণের বহুবিচিত্র সাধনার মধ্যে হনুমানের দাস্যভাবের সাধনাই শুধু নয় এরূপ আরও নানা পদ্ধতি লইয়া তিনি বহু সময় মগ্ন থাকিতেন।

এক সময় একজন সাধক তাঁহাকে বলেন যে, নিজেকে দীনাতিদীন ভাবিতে থাকিলে ক্রমে মন হইতে সকল প্রকার অহংকারের বীজ অপসারিত হয়। কথাটি পরমহংসের মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি ইহার পর হইতে নিজে অতি দীনভাবে জীবনযাপন আরম্ভ করেন। শিষ্য ও ভক্তগণের অলক্ষ্যে প্রতিবেশীদের মলমূত্রাগারে প্রবেশ করিয়া তিনি তাহা পরিষ্কার করিতে থাকেন, মলপাত্র নদীতে লইয়া গিয়া স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া আবার তাহা স্বস্থানে রাখিয়া আসিতেন। কয়েকদিন পূজার্চ্চনা ছাড়িয়া তিনি মনপ্রাণ দিয়া এই ঘৃণ্য কর্ম্মে নিজেকে লিপ্ত রাখিলেন। পরে ভক্তগণ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে এই কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে।

এ জাতীয় অদ্ভুত আচরণ ব্যতীত তাঁহার দৈনন্দিন আহার বিহারেও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন লক্ষিত হইত। দিনের পর দিন তাঁহার অনাহার ও অনিদ্রায় কাটিয়া

যাইত। দেহের স্বাভাবিক সহ্য-শক্তির একটা সীমা রহিয়াছে যাহা অতিক্রান্ত হইলে স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং গলনালীতে দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধি দেখা দেয়। ইহার ফলেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

রামকৃষ্ণের দেহে একটি বিস্ময়কর স্নায়বিক পরিবর্ত্তনের লক্ষণ প্রায়ই দেখা দিত। যখনই তাঁহার মনে কোন আবেগ বা উচ্ছ্বাস দেখা দিত সেই সময়ই তিনি কিছুক্ষণের জন্য অচেতন হইয়া পড়িতেন—তাঁহার মুখমণ্ডল একটি অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। দেখিলে মনে হইত যে, ভিতরে একটি তীব্র অধ্যাত্ম-আবেগ তরঙ্গায়িত হইতেছে। শুনিয়াছি চৈতন্য, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষদেরও নাকি ভাবাবেগের ফলে অনুরূপ বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থা হইত। ভাবমগ্ন অবস্থায় মহম্মদ যে সকল বাণী উচ্চারণ করিতেন তাহাই কোরাণে লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় সাধকদের জীবনেও দেখা যায়, ভাবময়তার ফলে তাঁহারা অচৈতন্য হইয়া পড়িতেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও আমরা দেখি যে, কীর্ত্তন সভা বা হরিবাসরে কীর্ত্তন জমিয়া উঠিলে অনেক ভক্ত বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হন। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যে উচ্চতর ভাবানুভূতি কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়—রামকৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি সাধকগণের জীবনে তাহা প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে।

তাঁহার এই ভাবাবেগজনিত মূর্চ্ছা যে অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে হইয়াছে, ইহা একদিন তিনি নিজেই আমাকে বলিয়াছিলেন। একদিন আমি তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ ও ঘন ঘন অচেতন হওয়ার বিষয় লইয়া অভিযোগ করিতেছি শুনিয়া তিনি আমায় বলিলেন—তুমি ঠিকই বলেছ, ভাবতন্ময়তাই আমায় শেষ করবে। যে সাধুসন্তরা আসতেন, তাঁদের এত সব নির্দ্দেশ পালন করতে গিয়েই আমার এ অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

অত্যধিক কঠোর তপশ্চর্য্যার ফলে এক সময়ে কিছুদিনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের মস্তিষ্ক বিকৃতি পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল। একথাটা অনেকেরই জানা নাই। একদিন তিনি নিজেই আমাদের একথা বলেন। সেদিনের প্রসঙ্গটি যথাযথভাবেই উদ্ধৃত করিলাম।

একদিন আমি শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বসিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতেছি, এমন সময় কলিকাতা হইতে কয়েকজন ধনী ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হন। কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি কয়েক মিনিটের জন্য ঘরের বাহিরে চলিয়া যান। এই অবসরে তাঁহার ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয় আগন্তুকগণের নিকট মাতুলের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পর্কে নানা চমকপ্রদ কাহিনী বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন—মামার ভগবৎ-প্রেম এতো বেশী যে, বাইরের জগৎ সম্পর্কে তাঁর কোন চেতনাই থাকে না,

সময় সময় তিনি বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে যান।

হৃদয় শেষ কথাগুলি যখন বলিতেছিলেন সে সময় রামকৃষ্ণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অপরের সম্মুখে নিজের প্রশস্তিতে তিনি খুশী হন নাই, বরং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হৃদয়ের উদ্দেশে বলিয়া উঠিলেন—ওরে তোর যে এত হীনপ্রবৃত্তি তা তো জানতাম না! ধনী লোক, আর তাঁদের পোষাক পরিচ্ছদ ঘড়ি চেন দেখে মামার সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করছিস্। তুই কি আমার জন্য টাকা কড়ি যোগাড়ের মতলবে আছিস্ না কি রে? এরা যদি আমার সম্বন্ধে উঁচু ধারণা পোষণ না-ই করে, তাতে আমার কি এলো গেলো?

এই কথা কয়টি বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত ব্যক্তিদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—দেখুন' হৃদয়ের মুখ থেকে আপনারা যা শুনেছেন তাহা কিন্তু মোটেই সত্য নয়। ভগবৎ-প্রেম আমাকে বাহ্যজ্ঞানহীন করেছে তা সত্য নয়। মধ্যে কিছুকাল আমার মস্তিষ্ক বিকৃতিই ঘটেছিল। সে সময় আমি একেবারে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ি। তাছাড়া, আমার এ অবস্থা কেন হয়েছিল তাও বলছি—মন্দিরে আগত সাধকগণের নির্দ্দেশে নানা প্রক্রিয়া ও কঠোর ব্রতাদি পালন করতে করতে আমার মাথা তখন খারাপ হয়ে যায়। আমার বাহ্যজ্ঞানহীনতা ভগবৎপ্রেমের জন্য নয়—তা মাথার গণ্ডগোলেরই লক্ষণ, আর খুব বেশী কৃচ্ছ্রসাধনের জন্যই তা হয়েছিল।

সেদিন রামকৃষ্ণের এ সরল ও অকপট উক্তি আমাকে তাঁহার প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল না করিয়া পারে নাই। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার কতকগুলি সাধন পদ্ধতির তাৎপর্য্য আমি বুঝি নাই বা মানিয়া লইতেও পারি নাই সত্য, কিন্তু দীর্ঘদিন যাতায়াত ও বিভিন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়া তাঁহার যে পরিচয় পাইয়াছি, সে অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি—আমার জীবনে আমি এরূপ ভগবদসমর্পিত -চিত্ত, মহাসাধক কমই দেখিয়াছি। ঈশ্বর লাভের জন্য কেহ যে এরূপ ত্যাগ তিতিক্ষা ও কঠোর জীবন স্বেচ্ছায় বরণ করিতে পারে, এ ধারণাও পূর্ব্বে আমার ছিল না।

পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই সিদ্ধান্তেই আসি যে, রামকৃষ্ণ কেবলমাত্র সাধক বা ভক্ত নহেন—তিনি সিদ্ধপুরুষ। প্রত্যক্ষ অধ্যাত্মদৃষ্টি দিয়া তিনি যে পরম সত্যকে দর্শন করিয়াছেন, যে সত্য তাঁহার সাধনজীবনের উৎসরূপে বর্ত্তমান—তাহা ঈশ্বরীয় মাতৃমূর্ত্তি। ভগবানকে তিনি জগজ্জননীরূপে ভাবিতে ভালবাসিতেন। মাতৃস্নেহের একটি অপার্থিব অমৃতধারার মাঝে তিনি পরম-আশ্রয় লাভ করেন, ইষ্টকে মাতৃভাবে আরাধনা করিয়াই তাঁহার সাধনা, সিদ্ধি ও পরম প্রাপ্তি ঘটে। তাঁহার মনোজগতে ও জীবন সত্তায় 'মা' ব্যতীত আর কোন বস্তুর যেন অস্তিত্বই ছিল না। সেজন্য মায়ের গান শুনিলে তিনি ভাবস্রোতে নিমজ্জিত হইয়া একেবারে সম্বিৎ হারাইয়া ফেলিতেন।

ইষ্টতে রামকৃষ্ণের এই মাতৃজ্ঞান কিন্তু কোন একটি দেবীমূর্তির মধ্যেই সীমিত ছিল না, তাহা মূর্তিকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বব্যাপী সত্তারূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি যখন তাঁহার মায়ের কথা বলিতেন তখন সে মাতৃরূপের বর্ণনা চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তির সীমাকে ছাড়াইয়া অনন্তব্যাপিনী মাতৃমূর্ত্তিকেই যেন রূপায়িত করিয়া তুলিত। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় কালী ও কৃষ্ণের এক পরম মধুর সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তিনি বলিতেন—মানুষ মূর্খ, তাই কালী ও কৃষ্ণের বৈষম্য নিয়ে মিথ্যেই ঝগড়া করে। আসলে, যিনি কালী তিনিই যে কৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক চেতনায় জগজ্জননীর যে বিশ্বব্যাপিনী মাতৃরূপ প্রকাশ লাভ করে তাহাতে খণ্ডতা অপূর্ণতা বা বৈষম্যের কোন স্থান ছিল না। তাই বিভিন্ন সর্ব্ব ধর্মের মধ্যেকার সমন্বয়ের মূল সূত্রটি তিনি অনায়াসেই ধরিতে সক্ষম হন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আজ মনে পড়িতেছে।

ভবানীপুরের এক খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকের সহিত সে সময় আমার বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। আমার মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের বহু কথা শুনিয়া তিনি এই শক্তিমান সাধক পুরুষকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। আমি একদিন বন্ধুটিকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হই। রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইবার কালে বলিলাম -ইনি একজন খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক, লোকমুখে ও আমার কাছে আপনার কথা শুনে আপনাকে দেখ্তে এসেছেন।

আমার কথা উত্তর দিবার পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন—মহাত্মা যিশুর চরণে আমার শত শত প্রণাম।

যিশু সম্পর্কে একটি অপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকের এরূপ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আগন্তুক খৃষ্টান যাজকটিকে বিস্মিত করিয়া তুলিল। তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—মশাই, আপনি যিশুর চরণোদ্দেশে যে নত হয়ে প্রণাম করলেন তার তাৎপর্য্য কি?

রামকৃষ্ণ মধুর কণ্ঠে বলিলেন—সে কি গো! তাঁকে প্রণাম করব না? তিনি যে ভগবানের অবতার! মানুষকে ত্রাণ করবার জন্য নরদেহে মর্ত্ত্যে অবতরণ করেছিলেন।

বন্ধু ততোধিক বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—অবতার? ঈশ্বরের অবতরণ? আমি কিন্তু এর কোন অর্থই বুঝলাম না। আপনি কি দয়া করে আমায় আর একটু পরিষ্কার করে এ কথাগুলো বুঝিয়ে দেবেন?

—এ দেশে যিনি রাম, কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন যিশুও তাঁর সেইরূপ আর এক প্রকাশ। তুমি ভাগবত পড়নি? তাতে লেখা আছে, অনন্ত শক্তিমান ভগবান জীবের কল্যাণার্থে নরদেহে বহুবার অবতরণ করবেন।

—আমি কিন্তু এখনও এর তাৎপর্য্য বুঝতে পারছিনে। আপনি যদি দয়া করে

আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন তা হলে বাধিত হবো।

—একটা সাধারণ কথা দিয়েই বলি। আচ্ছা, সমুদ্রের কথাই ধর। যখন এর দিকে তাকাও, এর অনন্ত জলরাশি ছাড়া কিছুই দৃষ্টিপথে আসে না। কিন্তু ঠাণ্ডায় যখন জলভাগের কিছুটা জমে যায় তখন এই অসীমতার মধ্যে তোমার দৃষ্টি সীমিত হয়, অবলম্বনের একটা ক্ষেত্র খুঁজে পায়, তুমি একে ইচ্ছে বা প্রয়োজন মত ব্যবহার করতেও পার। অবতার সম্পর্কেও সেই একই কথা। ঈশ্বর অনন্ত, অরূপ, বিশ্বব্যাপী। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে এই অসীম শক্তি সীমার মাঝে রূপ নিয়ে আসেন। এই শক্তি যাঁদের, তাঁদের আমরা বলি মহাপুরুষ, মহত্মা বা অবতার। অবতার ঈশ্বরের বিশেষভাবের প্রকাশকেই বুঝায়। মহাপুরুষদের লোকোত্তর জীবনের মধ্যে দিয়েই লীলাময়ের স্বর্গীয় সত্তার প্রকাশটি ঘটে। এ হচ্ছে অবতারের ব্যাখ্যা।

—এবারে আমি আপনার কথা বুঝলাম, কিন্তু এ তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারছিনে।

এই কথা কয়টি বলিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে বন্ধু আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন —অবতারবাদ সম্পর্কে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের অভিমত কি বলুন তো।

রামকৃষ্ণ এবার হাসিয়া বলিলেন—ও মুর্খদের (ব্রাহ্মদের) কথা আর ব'লোনা। এ সত্য বোঝবার মত দৃষ্টি ওদের নেই।

আমি অমনি বলিয়া উঠিলাম—আপনাকে কে বলেছে যে, মহাপুরুষদের লোকোত্তর সত্তা সম্বন্ধে আমরা আস্থাবান নই?

রামকৃষ্ণ ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—সত্যই কি তোমরা ঈশ্বরের অবতরণ বিশ্বাস কর? আমার তো সে ধারণা ছিল না!

এ প্রসঙ্গ এইখানেই সমাপ্ত হইল। ইহার পর রামকৃষ্ণ তাঁহার সেই শিশুসুলভ ভঙ্গীতে ও ভাষায় অধ্যাত্মজগতের বহু নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিতে থাকেন। খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকটি সেদিন তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া যান। রামকৃষ্ণের গভীর সত্যোপলব্ধি সেদিন আমাকেও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহার পর হইতে আমি যখনই অবসর পাইতাম দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট যাইতাম। তাঁহার সহিত বহুবার সাক্ষাৎ করিয়াছি। তাঁহার মুখনিঃসৃত পরমতত্ত্বের বহু মূল্যবান ব্যাখ্যা শুনিবার সুযোগও কম পাই নাই কিন্তু পৃথকভাবে সেগুলি আজ আর স্মরণ নাই। স্মৃতিপটে যে ঘটনাগুলি তখন বিশেষভাবে রেখাপাত করিয়াছিল তাহারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

আমি একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে বসিয়া আছি, কয়েকটি ভক্তও সেখানে উপবিষ্ট। পরমহংস হঠাৎ এক সময়ে কক্ষ হইতে বাহিরে গিয়াছেন। ভক্তেরা নিজেদের মধ্যেই ঈশ্বরের গুণাগুণের বিচার আরম্ভ করিলেন। তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে কহিলেন—চুপ কর্‌তো তোরা, ঈশ্বরের গুণাগুণের কথা

এভাবে বিচার করে কি লাভ বল্ দেখি। তাঁর মহিমা বুঝতে হ'লে স্মরণ, মনন, ধ্যান ধারণা দিয়ে তা করতে হয়, তর্ক করে কি তা বুঝা যায়? ঈশ্বর যে করুণাময় একথা কি যুক্তি দিয়ে সত্যিই আমায় বোঝাতে পারিস? এই যে সেদিন সাবাজপুরে বন্যা আর ঝড়ে শত শত লোকের প্রাণ নষ্ট হ'ল এ কি করুণার নিদর্শন? তোরা হয়ত বলবি, এই ধ্বংসের ফলে ভবিষ্যতের নতুন সৃষ্টির পথ পরিষ্কার হল! কিন্তু আমি তর্ক করে বল্‌বো—যিনি সর্ব্বশক্তিমান, একদিকে সৃষ্টি করতে হলে কি তাঁকে আবার আর এক দিকে ধ্বংস করতে হবে? শত শত অসহায় শিশু, নারী, বালক, বৃদ্ধের কান্নার মধ্যে দাঁড়িয়ে কি ঈশ্বরের করুণার কথা কল্পনা করা যায় রে?

একজন ভক্ত শ্রোতা অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল—তবে কি বল্‌তে হবে, ঈশ্বর নিষ্ঠুর!

শ্রীরামকৃষ্ণ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—আরে বোকা, কে তোকে তা বল্‌তে বলছে? ঈশ্বরের গুণাগুণ নির্ণয় কে করবে? তাঁর অনন্ত মহিমার অন্ত কে করবে। তাইতো বলছি, কাতর হয়ে, যত্ন করে শুধু এই প্রার্থনা কর্—ঈশ্বর! তোমার মহিমা বুঝবার মত ক্ষমতা আমাদের নেই, তুমি কৃপা করে আমাদের জ্ঞান নেত্র খুলে দাও।

এই বলে তিনি একটি সুন্দর গল্প সকলের সম্মুখে বিবৃতি করিতে লাগিলেন।

—এক বাগানে একটা আম গাছের নীচে দুই বন্ধু পথশ্রান্ত হয়ে এসে বস্‌লো। ওদের একজন তৎক্ষণাৎ কাগজ পেন্সিল নিয়ে আমগাছের হিসাব-নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অপরজন প্রকৃত বুদ্ধিমান, সে এসব চিন্তা না করে পাকা আমগুলো তৎক্ষণাৎ পেড়ে খেতে শুরু করলো। সে জানে, আমের হিসাবে তার প্রয়োজন নেই, সে আম খেতে এসেছে খাওয়ার তৃপ্তিই তার কাম্য। আমাদের সম্পর্কেও ঠিক একই কথা! আমরা ক্ষুদ্র মানুষ, ঈশ্বরের গুণের বিচারে আমাদের কাজ কি? আমরা আনন্দে তাঁর নামসুধা পান করে যদি তৃপ্ত হই, তাই কি পরম লাভ নয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে থাকেন—বাগানে যে দুই বন্ধু এসে ঢুক্‌লো তাদের মধ্যে যে পাকা আমটি খেলো প্রকৃত লাভবান সে-ই—এ সম্পর্কে কারুর সন্দেহ থাকতে পারে না। সে জানে, অপরের বাগানে স্বল্পক্ষণের জন্য এসে হিসাব করতে বসা মূর্খতা।

ভক্তেরা একবাক্যে মাথা নাড়িয়া তাঁহার কথা সমর্থন করিলে পরমহংস হাসিয়া বলিলেন—ওরে, মানুষের জীবনও তো এমনি অল্পস্থায়ী। এই সময়ের মধ্যে ঈশ্বরের গুণাগুণ বিচারে সময়ের অপচয় করবি কেন! অনন্ত শক্তির হিসাব কে কর্‌তে পারে? তার চাইতে তাঁর নাম গান করে আনন্দলাভ করলেই বরং

জীবনের চরিতার্থতা। সমস্ত প্রাণ মন সমর্পণ করে তাঁর নাম গান করে যা, তিনিই কৃপা করে তাঁর অনন্ত মহিমার রাজ্য তোর সামনে উন্মোচন করবেন। আমাদের আর হিসেবে প্রয়োজন কি?

সম্মিলিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত। এই নিরক্ষর গ্রাম্য সাধকের মুখে গভীর তত্ত্বজ্ঞানের এরূপ সরল ব্যাখ্যা শুনিয়া সেদিন সকলেই বিস্মিত হইয়া যান।

একদিন আমি রামকৃষ্ণের কক্ষে বসিয়া আছি, এমন সময় কলিকাতা হইতে একদল ভক্ত আসিয়া উপস্থিত। এক ভদ্রলোক শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলেন—অধ্যাত্মসাধনায় সদ্‌গুরু প্রাপ্তির উপর জোর দেওয়া কি সত্যই অপরিহার্য্য?

রামকৃষ্ণ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—নিশ্চয়ই, জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্যে বলেই মানুষ আধ্যাত্মিক জীবনে ঈশ্বরপ্রাপ্ত গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে। এপথে গুরুর করুণা যে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। গুরুই শিষ্যকে প্রধানতঃ এপথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন শিষ্যের চেষ্টার তেমন প্রয়োজন নেই। তবে ব্যক্তিগত চেষ্টায়ও কাজ হয়, কিন্তু গুরুই সেই দুর্গম পথকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে সুগম করে দিতে পারেন।

এই বলিয়া তিনি সম্মুখে প্রবাহিনী গঙ্গায় চলমান একখানি বাষ্পীয়পোতের দিকে সমাগত ভক্ত ও দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তারপর বলিলেন—আচ্ছা ষ্টীমারটি চুঁচুড়ায় কখন পৌঁছবে বলতে পার?

একজন উত্তর দিলেন—সন্ধ্যা পাঁচটা-ছয়টা হবে।

—হালটানা নৌকোর সেখানে পৌঁছতে পনের কুড়ি ঘণ্টারও বেশী সময় লাগবে। কিন্তু নৌকোটিকে যদি ওই বাষ্পীয়যানটির সঙ্গে জুড়ে দাও তবে সেও ওটার মত অল্প সময়ের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবে। যারা মুক্তি চায় তাদের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যবস্থা। তুমি যদি গুরুর নির্দ্দেশ ছাড়াই এপথে চলতে আরম্ভ কর, তা হলে বহু বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে তোমার সময় ও পরিশ্রম কম যাবে না কিন্তু গুরু সহায়ে সহজে ও স্বল্প সময়ে তা সম্ভব হয়। এই হচ্ছে ধর্ম্মজীবনে গুরু সহায়ের তাৎপর্য্য।

অপর একদিন এক ভক্ত তাঁহাকে প্রশ্ন করেন—জ্ঞান ও ভক্তি এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি বড়?

সংস্কৃত সাহিত্যে অনভিজ্ঞ সাধকের ব্যাকরণগত ত্রুটি আমার শিক্ষিত মনকে ঝাঁকুনি দেয় সত্য, কিন্তু তাঁহার অনাড়ম্বর সরল ও প্রাণস্পর্শী ব্যাখ্যা আমার মনকে বিশেষভাবে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। সংস্কৃত ব্যাকরণে 'জ্ঞান' ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু নিরক্ষর রামকৃষ্ণ জ্ঞানকে পুরুষরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন—জ্ঞান পুরুষ, সেজন্য তাকে সকল সময়ই মহামায়ার অন্তঃপুরের বাইরে অপেক্ষা করতে হয়—ভেতরে প্রবেশের অধিকার তার নেই। কিন্তু ভক্তি

নারী, মায়ের অন্তঃপুরে তার অবাধ গতি, মায়ের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভে তার কোন বাধাই নেই। জ্ঞানের পথ আয়াস সাপেক্ষ, কিন্তু ভক্তির সরসতা গমন পথকে স্নিগ্ধ করে, পথের বাধার রুক্ষতা দূর করে দেয়।

জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মত দুরূহ তত্ত্বকে এমন সহজভাবে ব্যাখ্যা করা চলে, একথা পূর্বে কখনও ধারণা করিতে পারি নাই। তাঁহার সান্নিধ্যে ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে, পরমতত্ত্বের সম্যক উপলব্ধি না হইলে বিশ্বসংসারের সমস্যা কাহারো নিকট এমন সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠে না। তাঁহার ব্যাখ্যাত তত্ত্বগুলি এতই প্রত্যক্ষ ও সহজ যে, তাহা যে কোন মানুষই সাধারণ জ্ঞান দিয়া বুঝিতে পারিত।

একদিনের ঘটনার কথা বলি। শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহীদের সাধনার কথা বলিতেছেন, এক ভক্ত বলিয়া উঠিলেন—গৃহীরা ধ্যান ধারণা করবে কখন? দিবারাত্র সংসারের কাজে তারা মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, এ অবস্থায় ভগবদ্‌ভজনের অবসর কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—ওর মধ্যেই হয়। গ্রামদেশের চিঁড়েকুটুনী মেয়েদের দেখেছ? ওরা চিঁড়ে কুট্‌বার সময় একহাতে ঢেঁকির ভেতরের ধান ওল্টায়, আর একহাতে শিশুকে স্তন দেয়; আবার ব্যাপারী এলে তার সাথে চিঁড়ের দর কষাকষি করে। করে সে সব কাজই কিন্তু মনটি দিয়ে রাখে ঢেঁকির গড়ের দিকে। সে জানে, অন্যমনস্ক হলেই তার হাত ঢেঁকীর ঘায়ে চূর্ণ হয়ে যাবে। সংসারী লোকেরা চিঁড়ে কুটুনীর মতই সমস্ত মনটি ঈশ্বরের দিকে রেখে সকল কাজ করে যেতে পারে, তাতেই কাজ হবে।

সাধক রামকৃষ্ণের সমগ্র জীবনটি ভগবদ্‌সত্তায় এমনই ভরপুর ছিল যে, সেখানে যেকোন বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানই নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইত। আন্তরিকতাহীন অনুষ্ঠান বা আড়ম্বর তিনি পছন্দও করিতেন না।

একদিন ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া তিনি বসিয়া আছেন। কথাপ্রসঙ্গে মালা জপের প্রসঙ্গ উঠিল। একটি ভক্ত পরমহংসকে প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা দেব দেবীর নাম স্মরণের জন্য মালা জপের কি সত্যিই কোন সার্থকতা আছে?

রামকৃষ্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলিলেন—হ্যাঁগো, যদি তার পেছনে আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকে। কিন্তু আন্তরিকতাহীন নাম জপে কোন ফলোদয়ই হয় না। যেমন ধর টিয়া পাখীর হরির নাম করা। পোষা পাখীকে রাধা-কৃষ্ণ বুলি শেখাও, সে পড়তে শিখবে এবং কারণে অকারণে সেই শিখানো বুলি পড়ে শ্রোতাদের চমৎকৃত করবে। কিন্তু যদি কোন দিন তাকে বেড়ালে আক্রমণ করে, তখন কিন্তু তার মুখ দিয়ে আর রাধাকৃষ্ণ বুলি বার হবে না। সে তখন প্রাণ ভয়ে

মাতৃভাষায় 'ক্যা' 'ক্যা' শব্দই করতে থাকবে। তার কারণ, রাধাকৃষ্ণ তার শেখা বুলি, অন্তরের কথা নয়, সেজন্যই সংকটকালে সে-বুলি ভুলে যায়।

তিনি বলিয়া চলিলেন—আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতাহীন ধর্ম্মাচরণকারীদের অবস্থা টিয়াপাখীর মতই হয়ে থাকে। ধর্ম্মানুষ্ঠান তাদের জীবনের বহিরঙ্গ ব্যাপার, তাই সংকটমুহূর্ত্তে তারা টিয়াপাখীর মতই এটা বিস্মৃত হয়ে যায়—ফলে ধর্ম্মের মুখোস খুলে স্বরূপ প্রকাশ পায়। বিশ্বাস বা ভক্তির জোর না থাকলে ধর্ম্মের ভাব অল্প আঘাতেই ছুটে যায়। যে বিশ্বাস জীবনের সংকটকালে টিকে থাকতে পারে না সে আবার বিশ্বাস নাকি?

এরূপ ধরণের কথা বহুবারই শুনিয়াছি। কিন্তু তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সহজ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া তাহার প্রত্যক্ষতা নূতনরূপ লইয়াই প্রত্যেকটি ভক্তের অন্তর স্পর্শ করিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত কথোপকথনের বহু স্মৃতি মনের দ্বারে ভিড় করিতেছে। সকল কথা বলিতে হইলে প্রবন্ধের দীর্ঘতা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া সে ইচ্ছা ত্যাগ করিলাম। আমার প্রতি প্রেমিক শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর স্নেহ প্রদর্শনের কয়েকটি ঘটনা বলিয়া এ রচনা শেষ করিব। সংসারী মানুষের ভালবাসা প্রয়োজনের সীমায় বদ্ধ কিন্তু তাঁহার স্নেহ যেন স্রোতস্বিনী, আপন গতিতেই উহা পরিপূর্ণ ও সার্থক। তাঁহার এই অহেতুকী স্নেহের ধারায় আমার জীবন ধন্য হইয়াছে। ছোট্ট একদিনের একটি ঘটনা বলিতেছি।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকায় আমি কিছুকাল দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাইতে পারি নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই আমার সংবাদ লইতে কোন না কোন ভক্তকে পাঠাইতেন, আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে বলিতেন। আমিও যাইব বলিয়া প্রায়ই প্রতিশ্রুতি দিতাম কিন্তু নানা কার্য্যের মধ্যে তাহা রক্ষা করা সম্ভব হইত না। অবশেষে স্নেহপরায়ণ পরমহংস একদিন অন্যত্র যাইবার পথে আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন।

আমার কাছ ঘেঁষিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে তিনি বলিলেন—কিগো, আমার কথা বুঝি তোমার মনে পড়ে না। যাব, যাব, বল—অথচ যাও না। ব্যাপার কি তোমার?

উত্তরে বলিলাম—সমাজের কাজ নিয়ে বড় ব্যতিব্যস্ত আছি। সেজন্য ইচ্ছাসত্ত্বেও যেতে পারিনি।

শিশুর মত রুষ্ট ও অভিমানাহত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—চুলোয় যাক্ তোমার ব্রাহ্মসমাজ। যে কাজ করলে বন্ধুর সাথে দেখা করা যায় না অমন কাজ করে লাভ কি?

একটু থামিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ তিনি কৌতুকপূর্ণ ভঙ্গীতে বলিলেন—কি মজা হয়েছে জান? আমি যখন তোমার বাড়ী আসছি,

তখন আমারই একজন ভক্ত আমায় বলে—আপনি একজন ব্রাহ্মের বাড়ী যাচ্ছেন কেন? তিনি এমন কি পদস্থ ব্যক্তি যে আপনি নিজে তাঁর কাছে যাবেন?—আমি উত্তরে তাদের কি বলেছি জান?—

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইতেই পরমহংস বলিলেন—আমি বললাম, আমার কাছে সে যে তোমার চাইতে কোন অংশেই কম প্রিয় নয়।

দমদমের এক বাগানবাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজের এক উৎসবে আহূত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হন। আমার সেখানে পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হয়। আমি পৌঁছিয়া দেখি তিনি শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হইয়া কীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিতেছেন ও নামে বিভোর হইয়া আছেন। সেই অবস্থায় আমাকে দেখিয়াই তিনি ক্ষিপ্রগতিতে আমার নিকট আসিলেন ও আমায় বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

অতঃপর স্নেহমাখা স্বরে বলিতে লাগিলেন—তুমি আসনি, তাই এতক্ষণ এত আনন্দের মধ্যেও যেন কিসের অভাব বোধ হচ্ছিল। এখন আমার মন পূর্ণ আনন্দ লাভ করেছে।

ইহা বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিগুণ উৎসাহে নাম গান ও নৃত্যে মগ্ন হইয়া গেলেন। এই অল্প কয়েকটি কথার মধ্য দিয়া আমার প্রতি সাধকের গভীর স্নেহের স্পর্শ পাইয়া ধন্য হইয়া গেলাম।

আরও একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। অনেকদিন পর সেদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি। পরমহংসকে তাঁহার কক্ষে না দেখিয়া ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করিতেছি। হঠাৎ যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি একটি গাছের নীচে দাঁড়াইয়া তীর ধনুক সহযোগে একদল কাক তাড়াইতে ব্যস্ত। হাবভাবে মনে হইতেছে, সে সময়ে ইহা অপেক্ষা আর কোন কাজই তাঁহার জীবনে বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তাঁহার এই শিশুসুলভ ব্যস্ততা কৌতূহলোদ্দীপক। সহাস্যে প্রশ্ন করিলাম—কি ব্যাপার? আপনি দেখছি একজন তীরন্দাজ হয়ে উঠলেন।

আমার কণ্ঠস্বরে চমকিয়া পিছন ফিরিয়া রামকৃষ্ণ আমাকে দেখিলেন। দীর্ঘদিনের পরে দেখা, তাই আমার উপস্থিতি তাঁহাকে স্নেহবিহ্বল করিয়া তুলিল। তীরধনুক তৎক্ষণাৎ মাটিতে ফেলিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন ও আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই দেখা গেল, তিনি গভীর ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছেন। ধীরে ধীরে তাঁহাকে তাঁহার কক্ষে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর তিনি সুস্থ হইলেন। অতঃপর তিনি যে কথাটি বলিলেন তাহাতে যে কেহ বিস্মিত না হইয়া পারিবে না। তিনি বালকের মত আবদার করিয়া কহিতে লাগিলেন—ওগো, তুমি আমাকে

চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে? এখানকার একজন আমায় একবার চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখাতে নিয়ে যাবে বলে কথা দেয়, শেষ পর্যন্ত তা রাখেনি।

সাধকের সমস্ত মুখমণ্ডলটি তখন এক অকপট কৌতূহল ও বালসুলভ আগ্রহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি পরম উৎসাহে বলিয়া চলিলেন—আচ্ছা, তোমার সিংহ দেখতে কেমন লাগে, জগজ্জননী দেবী দুর্গার সাক্ষাৎ বাহন!—বলিতে বলিতে তাঁহার মধ্যে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি জাগ্রত হইয়া উঠিল। ভাববিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া অস্ফুট স্বরে বার বার তিনি বলিতে লাগিলেন—ওগো তুমি আমায় সত্যিই নিয়ে যাবে তো?

আমি বলিলাম—সিংহ আমি এর আগে বহুবার দেখেছি। আপনার সঙ্গে থেকে আবার দেখতে পেলে খুশীই হ'তাম, কিন্তু আজ আমার নানা জরুরী কাজ রয়েছে। তবে আমি আপনাকে আজ সুকিয়া ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে নরেন্দ্রের সঙ্গে চিড়িয়াখানায় যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

রামকৃষ্ণ এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশমত আমি একখানি ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করিয়া তাঁহাকে লইয়া সুকিয়া ষ্ট্রীট অভিমুখে রওনা হইলাম। স্থির হইল, মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউশন হইতে নরেন্দ্রনাথ (পরবর্ত্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া চিড়িয়াখানায় লইয়া যাইবেন।

সাধকপুরুষ রামকৃষ্ণের ভাবগম্ভীর অধ্যাত্ম-জীবনের সহিতই আমাদের পরিচয় ছিল, সে মানুষ যে এত রসিক এ সংবাদ পূর্ব্বে আমার জানা ছিল না। সেদিন তাঁহার রসিকতা দেখিয়া আমি সত্যই বিস্ময়বোধ করিয়াছিলাম। তিনি গাড়ীতে উঠিয়াই আমার বাম পার্শ্বে বসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমি প্রথমে তাঁহার এই ইচ্ছার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য বুঝি নাই। তিনি কিন্তু আমার পাশে বসিয়াই যে ভঙ্গি করিলেন তাহা যেমন বিচিত্র তেমনি কৌতুককর। সকলে যথারীতি আসন গ্রহণ করিলে গাড়ী ছাড়িল। গাড়ীটি দক্ষিণেশ্বর মন্দির ছাড়িতেই রামকৃষ্ণ হঠাৎ তাঁহার স্কন্ধের চাদরখানি লইয়া নব পরিণীতা বধূর মত নিজের মাথায় ঘোমটা টানিয়া আমার পাশে আসিয়া বসিলেন। আমি তাঁহার এ আচরণের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বধূর মত সলজ্জ দৃষ্টি তুলিয়া সকৌতুকে বলিলেন—আমি যে তোমার প্রেমিকা। প্রেমিকের সাথে বেড়াতে চলেছি। মাথায় ঘোমটা দেব না!—এই বলিয়া একখানি হাত সপ্রেমে আমার বক্ষে স্থাপন করিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে বসিয়া রহিলেন।

এই কৌতুকের ভাবটি অবলম্বন করিয়াই কিন্তু সাধকের সমগ্র সত্তায় আধ্যাত্মিক ভাবের অবতরণ ঘটিল। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম এক দিব্য ভাবের ব্যঞ্জনায়

ও অপার্থিব আনন্দে তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডলটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ভাবাবেশে তিনি বাহ্যজ্ঞানহীন। মাঝে মাঝে অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন—মা জগজ্জননী, আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ করে দিসনে। আমি চিড়িয়াখানায় গিয়ে সিংহ দেখব, আনন্দ করবো। আমায় সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করিসনে।

বলিতে বলিতে গভীর ভাবাবেশে বাহ্যচৈতন্যরহিত হইয়া তিনি আমার বক্ষে এলাইয়া পড়িলেন। আমি ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দ স্তব্ধ বিস্ময়ে এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পর তিনি ভাবলোক হইতে নামিয়া আসিলেন ও আবার তাঁহার শিশুসুলভ চপলতা ও সরস কথাবার্ত্তায় সকলকে আনন্দ দিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে গাড়ী সুকিয়া ষ্ট্রীটে পেঁীছিলে নরেন্দ্রনাথের দায়িত্বে তাঁহাকে চিড়িয়াখানায় পাঠাইয়া আমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

রামকৃষ্ণের জীবনের শেষ কয়েক বৎসর আমার সহিত তাঁহার খুব অল্পই দেখা হয়—অবশ্য ইহার পিছনে ছিল দুইটি কারণ। প্রথমতঃ, এ সময়ে তাঁহার নিকট কয়েকজন নূতন ভক্ত আসেন এবং তাঁহাদের মাধ্যমে তাঁহার সহিত রঙ্গমঞ্চের দু'একটি অভিনেতারও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মে। উক্ত ব্যক্তিদের আমি মোটেই পছন্দ করিতাম না। সুতরাং উহাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা আমার মনে তিক্ততারই সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন শিষ্য তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। আমি এই মতবাদ কোন সময়ই মানিতে পারি নাই। পাছে এই প্রসঙ্গ লইয়া অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এ আশঙ্কায় আমি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত বন্ধ করি।

অনেকদিন পরের কথা। একদিন আমারই এক বিশেষ পরিচিত ব্যক্তির নিকট রামকৃষ্ণের অসুখের সংবাদ পাইয়া বড় বিচলিত হইয়া পড়ি। সমস্ত কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া তখনি আমি দক্ষিণেশ্বরের অভিমুখে যাত্রা করি। তখন তাঁহাকে চিকিৎসার্থ স্থানান্তরিত করার কথাবার্ত্তা চলিতেছে। আমাকে দেখিয়া তো কিছুক্ষণ তিনি রুদ্ধ অভিমানে চুপ করিয়া রহিলেন। আমি কেন তাঁহার এত অসুখেও দেখিতে আসি নাই ইহা লইয়া বারবার অনুযোগ করিতেও ছাড়িলেন না।

আমার ব্যবহারে তিনি আন্তরিক ব্যথা পাইয়াছেন দেখিয়া আমিও দুঃখিত না হইয়া পারি নাই। আমি অকপটে তাঁহাকে না আসিবার কারণ দুইটি জানাইয়া দিলাম; আরও বলিলাম—আপনার শিষ্য ও ভক্তেরা আপনাকে ঈশ্বরের এক নূতন সংস্করণরূপে যেভাবে প্রচার আরম্ভ করেছে, তাতে—আমি সাধারণ মানুষ, ঈশ্বরের এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে ভরসা পাইনে।

সরল অনাবিল হাস্যে সমস্ত কক্ষটি মুখরিত করিয়া রামকৃষ্ণ বলিলেন—একবার ভেবে দেখ, সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর গলার ক্যান্সারে মরতে বসেছে!

অতঃপর উৎসাহী শিষ্যদের উদ্দেশে স্বগতোক্তি করিলেন—বোকার অশেষ গুণ।

আমার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের ইহাই শেষ দেখা। ইহার পর চিকিৎসার্থ তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে তাঁহার চিকিৎসা চলে। কিন্তু যথাসময়ে রামকৃষ্ণের মুক্তাত্মা মরজীবনের অধ্যায় সমাপ্ত করিয়া পরলোকে চলিয়া গেল। যে পূতস্মৃতি তিনি রাখিয়া গেলেন, তাহা আজিও শত শত ভক্ত ও মুমুক্ষুর জীবনকে উজ্জীবিত করিতেছে।

তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার সময় খুব দীর্ঘ নয়, কিন্তু ঐটুক কালের মধ্যেই উহা গভীর ও আন্তরিক না হইয়া পারে নাই। তাঁহার জীবন ও বাণী আমার চলার পথেও সহায়ক হইয়াছে, আমার জীবনের বহু আধ্যাত্মিক আদর্শকে উহা রসপুষ্ট করিয়াছে। জীবনপথে যে সকল মনীষী ও মহাপুরুষের দর্শন লাভ ঘটিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস অবশ্যই তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

১৮২৮ সালের কথা! ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তখন বাঙ্গলাদেশের এক বিরাট উদীয়মান ব্যক্তিত্ব এবং যুব সমাজে আদর্শস্থানীয়। তাঁহার সহিত তখনও আমার সাক্ষাৎভাবে পরিচয় ঘটে নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার মহান আদর্শকে নিজ জীবনে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার অভিলাষ তখন হইতেই মনে মনে পোষণ করিতেছি। তাঁহার প্রতি আমার এই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের দুইটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ ডাক্তার সরকারের অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সৎসাহস। অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা ও পরিপার্শ্বের মধ্য হইতে তিনি কেবলমাত্র নিজের প্রতিভা, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার ফলে তৎকালীন সমাজে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা মহত্তর গুণাবলী তাঁহার ছিল—তাহা হইতেছে সত্যপ্রিয়তা ও তেজস্বিতা। নিজ অধ্যবসায়ের ফলে যে প্রতিষ্ঠা তিনি লাভ করেন, বৃহত্তর আদর্শের জন্য তাহা মুহূর্ত্তে মধ্যে ত্যাগ করিতে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় জাগে নাই। তাঁহার এই নির্ভীকতাই তৎকালীন যুবক সমাজের চিত্তকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়া নেয়।

ঘটনাটি অতি সাধারণ, কিন্তু ইহার পটভূমিকায় ডাক্তার সরকারের চরিত্রটি নিজ মহিমায় বিকাশ লাভের সুযোগ পাইয়াছিল।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে তিনি ছিলেন তৃতীয় এম, ডি, উপাধি প্রাপ্ত ছাত্র। মেডিক্যাল অ্যাসোশিয়েশনেও তখন তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিপত্তি। কিন্তু খ্যাতি ও সম্মানের সরল পথ দিয়া চলিবার বিধান ঈশ্বর ডাক্তার সরকারের জন্য দেন নাই। তাই কেবলই বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্য দিয়াই তাঁহার চরিত্রের বৃহত্তর দিকটি উন্মোচিত হইতে থাকে।

সে সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্ত পরিবারের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক বাবু রাজেন্দ্র দত্তের সহিত ডাক্তার সরকারের পরিচয় ঘটে। তাঁহার নিকট হইতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে নানা তথ্যাদি জানিয়া তিনি সে সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া উঠেন। মনোযোগসহকারে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িয়া তিনি চমৎকৃত হন এবং অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতি ছাড়িয়া হোমিওপ্যাথি শুরু করেন।

তৎকালীন ডাক্তারদের মধ্যে হোমিওপ্যাথী সম্পর্কে মোটেই ভাল ধারণা ছিল না। তাঁহাদের অ্যাসোশিয়েশনের একজন বিশিষ্ট্য সভ্য অপর এক নগণ্য প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইবে ইহা তাঁহারা কোন মতেই সহ্য করিতে

পারিলেন না। মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতি গ্রহণের প্রতিবাদকল্পে মেডিক্যাল অ্যাসোশিয়েশনে একটি বিরাট জনসভা বসিল।

অ্যাসোশিয়েশনের মাননীয় সভ্য ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগোষ্ঠী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার অসারতা প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর। সভার প্রত্যেক ব্যক্তিই সেদিন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। একজন চিকিৎসক ডাক্তার সরকারকে বলিয়া উঠিলেন—আপনার সমস্ত যুক্তিই অর্থহীন। এ ধরণের আদর্শ গ্রহণ করলে আমরা বাধ্য হয়েই আপনাকে আমাদের সমিতি থেকে বহিষ্কৃত করে দেব।

এই অপমানকর বাক্যে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিরাট মানুষটি বিন্দুমাত্র চঞ্চল না হইয়া শান্তকণ্ঠে বলিলেন—আপনারা আমায় অপমান করতে পারেন, আদর্শগত অনৈক্যের জন্য সমিতির তালিকা হতে নামও কেটে দিতে পারেন, তথাপি আমি সত্য থেকে ভ্রষ্ট হতে পারব না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির সুফল ও কল্যাণকারিতা সম্পর্কে আমার মনে কোন সংশয় নেই। আজ আপনারা এ সত্য অস্বীকার করেছেন, কিন্তু একদিন এ আপনাদের মানতেই হবে।

সত্যকে আঁকড়িয়া থাকার ফলে শ্রদ্ধেয় সরকারকে উত্তরকালে আরও অনেক দণ্ডই সহিতে হইয়াছিল।

উল্লিখিত ঘটনাটি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইলে প্রতিপক্ষ মহেন্দ্রলাল সরকার সম্পর্কে বহু পরিহাস ও বক্রোক্তি করিতে আরম্ভ করে। ক্রমাগত বিরুদ্ধ অভিমত শুনিতে শুনিতে একদল মহেন্দ্রলাল সরকারের সম্পর্কে আস্থাহীন না হইয়া পারে নাই। ইহাতে তাঁহার ব্যবসায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। কিন্তু এই বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে ক্ষণেকের জন্য তিনি বিচলিত হইলেন না বা নিজ মত পরিবর্ত্তনের চেণ্টা করিলেন না। একবার যাহা জীবনে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তাহা ত্যাগ করিবার চেণ্টা করেন নাই।

এ ঘটনার ফলে তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে ক্ষতি হইল সত্য, কিন্তু এই ক্ষতির অন্তরালে একটি কল্যাণকর অধ্যায়েরও সূচনা না হইয়া পারে নাই। পুরাতন বন্ধুবান্ধবের দল সরিয়া গেলেও তাঁহার নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা ও ত্যাগবরণ তৎকালীন যুবকদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করে।

আমরা দুই তিনজন বন্ধু একত্র হইলেই সে সময় মহেন্দ্রলাল সরকারের দুর্লভ চরিত্রের আলোচনা করিতাম। উক্ত ঘটনাটিই যেন তাঁহার সহিত আমাকে এক নিবিড় আত্মীয়তার যোগসূত্রে আবদ্ধ করে, তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত-ভাবে মিশিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়।

ঘটনাচক্রে সুযোগও মিলিয়া গেল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের কথা। আমরা তখন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবর্ত্তিত বিধবা বিবাহ আন্দোলনের

উৎসাহী সমর্থক। আমার একটি বন্ধু তাঁহার মতবাদে অনুপ্রাণিত হইয়া একটি বালবিধবাকে বিবাহও করিল। এই বন্ধুপত্নী একদিন হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহার অবস্থা সংকটাপন্ন হইয়া উঠে। অর্থাভাবে চিকিৎসা করাইবার উপায় নাই। এ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি চিঠি দিলেন এবং এ মহিলা চিকিৎসার অনুরোধ জানাইয়া আমাকে ডাক্তার সরকারের নিকট পাঠাইলেন। এই গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে মহেন্দ্রলালের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিল।

বিদ্যাসাগরের পত্র পাঠ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ রোগিনীর চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মত খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসকের ফি দিবার মত সামর্থ্য আমাদের ছিল না। কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর আন্তরিক ব্যবহার আমাদের সংকোচটি কাটাইয়া দিল। তিনি আমাদের পরমাত্মীয় হইয়া উঠিলেন। রোগিনীর অবস্থার বিবরণ লইয়া আমি প্রতিদিন সকালে বিকালে তাঁহার নিকট যাইতাম। রোগিনী যে বাঁচিবে না, তাহা তিনি বহুপূর্বেই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু পাছে এই দুঃসংবাদ আমাদের বিহ্বল করিয়া ফেলে, তাই তখন এ আশংকার কথাটি গোপন করেন। মৃত্যুর পূর্বদিন সকালের দিকে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়। আমি ত্বরিৎপদে ডাক্তারের নিকট ছুটিয়া যাই, কিন্তু তাড়াতাড়িতে ঔষধের শিশিটি আনিতে আমার ভুল হয়। ঔষধ দিবার জন্য ডাঃ সরকার আমার নিকট শিশিটি চাহিতেই আমার ভ্রমটি বুঝিতে পারি। যাহা হউক, কিছু বিলম্বে দোকান হইতে একটি শিশি আনা হয়। ইতিমধ্যে দু'একটি ছোটখাট কথা হইতে সেদিন এই প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসকের দৈববিশ্বাসী মনের সন্ধান পাইয়া আমি বড় বিস্মিত হই।

চিন্তিত মুখে ডাক্তার সরকার বলিলেন—দেখ, লক্ষণ ভাল ঠেক্‌ছে না, নইলে এ সময় কেন শিশিটি আনতে ভুল হবে? তাছাড়া, আর একটা শিশি সংগ্রহ করতেই বা কেন এত সময় লাগবে? চারিদিকের লক্ষণগুলি যেন রোগীর আরোগ্যলাভের প্রতিকুল বলে মনে হচ্ছে।

আমি বেশ একটু বিস্মিতকণ্ঠে বলিলাম—মশাই, আপনারা চিকিৎসক—বিজ্ঞানী ও যুক্তিবাদী। আপনারাই যদি তুচ্ছ ঘটনাকে নিয়তির বিধানের ইঙ্গিত বলে ধরে নেন, তা'হলে আমাদের মত সাধারণ মানুষের গতি কি হবে?

ডাক্তার সরকার মৃদু হাসিয়া কহিলেন—যা অস্বীকার করা যায় না, তাকে স্বীকার না করে উপায় কি? আমার চিকিৎসক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হতেই বল্‌ছি, এ জাতীয় তুচ্ছ ঘটনাগুলো যেন আসন্ন পরিণতির পূর্বাভাষ নিয়েই দেখা দেয়। তাছাড়া, এটা তো অস্বীকার করে লাভ নেই যে, মানুষের জীবন প্রকৃতই একটি অদৃশ্য শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আমরা যে আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, রোগ নির্ণয়-এর কৃতিত্ব নিয়ে গর্ব করি তা অন্ধকারে ঢিল

নিক্ষেপের মতই অনিশ্চিত ও অর্থহীন। সত্যি করে বলতো, মৃত্যু এসে যার শিয়রে দাঁড়িয়েছে কোন্ চিকিৎসক তাকে রক্ষা করতে পারে?

—তবে আপনি চিকিৎসা করেন কেন? রোগীদের তো বললেই পারেন; অদৃষ্টে বিশ্বাস করে সব বসে থাক, যা ঘট্‌বার তা ঘটবেই।

—আমার কথাগুলো বোধ হয় তোমার ঠিক মনে লাগ্‌ছে না, কিন্তু সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে তুমি চিন্তা করে দেখ, সমস্ত চিকিৎসা শাস্ত্রটিই কি অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতই অনিশ্চিত নয়? রোগীর রোগের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে কি আমরা কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে কখনো আসতে পারি? জীবন মরণের ওপর আমাদের করবার কিছুই নেই, এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও চিকিৎসা করি—যদি তাতে রোগীর কষ্টের কিছুটা লাঘব হয়, তার কল্যাণ হয়, এই ভরসায়। আমরা পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করি, যত্ন নিই। করি সবই কিন্তু শেষ পরিণতি যা হবার তাকে তো এতটুকুও পরিবর্ত্তিত করতে পারিনে!

ডাক্তার সরকারের এই অকপট স্বীকৃতি তাঁহার সম্পর্কে আমাকে শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিল। রোগিনী সম্পর্কে তাঁহার আশঙ্কা ও অগৌণে সত্যে পরিণত হয়, পরদিনই মহিলাটির মৃত্যু ঘটে। ডাক্তার সরকারের কথাগুলি আমার মনের কোণে আনাগোনা করিতে থাকে।

বন্ধুপত্নীর মৃত্যুর কিছুদিন পর আমি ভবানীপুরের খ্যাতনামা আইন ব্যবসায়ী মহেশচন্দ্র চৌধুরীর গৃহে কয়েকমাস অবস্থান করি। শ্রদ্ধেয় মহেশ বাবু আমার বিদ্যালয় জীবনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং সে সময় তিনি আমার অভিভাবক ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার উন্নত নৈতিক চরিত্র ও আইন ব্যবসায়ে পারদর্শিতা সে সময়ে দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিল। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারও মহেশবাবুর উদার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। তদবধি তাঁহার গৃহে কাহারও অসুখ বিসুখ হইলে তিনিই চিকিৎসা করিতেন।

পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক নানা অস্বাচ্ছন্দ্যের ফলে কিছুদিন যাবৎ আমার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না। তদুপরি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পরিশ্রমে তাহা আরও খারাপ হইতে থাকে। তখন ১৮৬৯ সাল। মহেশ চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে একদিন ডাঃ সরকার রোগী দেখিতে আসিয়াছেন। সেদিন তাঁহার সহিত আমার আবার সাক্ষাৎ হইল। আমার সহিত তাঁহার যে পূর্ব্ব হইতেই পরিচয়, সে কথা চৌধুরী বাড়ীর কেহই জানিতেন না। আমিও কাহাকেও এ সম্পর্কে কোন কথা বলি নাই। মহেন্দ্রবাবু রোগী দেখিতে আসিলে আমার বন্ধুরা আমায় বলিল—শিবনাথ, তোমার শরীর ত বড় খারাপ যাচ্ছে, ডাক্তারবাবুকে একবার দেখিয়ে নাও না?

আমি এ প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় তাঁহারা জোর করিয়াই আমাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়া বলিলেন—ডাক্তারবাবু, এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানটি আমাদের বাড়ীতেই থাকে। আমাদের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। কিছুদিন থেকে বড্ড ভুগ্‌ছে, আপনি যদি দয়া করে ওর চিকিৎসার দায়িত্ব নেন ত বড় ভাল হয়।

ডাঃ সরকার আমার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিলেন—দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানটি তো দেখ্‌ছি আমারও পরিচিত। কিন্তু এর হয়েছে কি?

অতঃপর তিনি আমার অসুখের সমস্ত উপসর্গগুলি বিস্তারিতভাবে লিখিয়া পরদিন তাঁহাকে দিবার জন্য বলিলেন। মাথা নাড়িয়া আমিও সম্মতি জানাইলাম।

ইহার পর ডাঃ সরকার আসল রোগীর পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। আমাদের পাশেই মহেশবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীশচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করার দোষটি ইঁহার স্বভাবগত। সেদিনও তিনি যথারীতি প্রেসক্রিপশান লিখনরত ডাক্তার সরকারকে উপর্য্যুপরি কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া ফেলেন। সকলেই ভীত হইলাম, কারণ আমরা জানিতাম, ডাক্তার সরকার অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে বড় বিরক্ত হন। কিন্তু তাহার পরিণতি যে এত তিক্ত হইবে তাহা ভাবি নাই। গিরীশবাবু দুই তিনটি প্রশ্ন করিতেই ডাঃ সরকার যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। চিৎকার করিয়া বলিলেন—আরে মশাই, আপনি তো আচ্ছা লোক! চিকিৎসা-শাস্ত্রে কি আপনার কোন জ্ঞান আছে! আমি যদি ওষুধের নাম বা রোগের নাম বলি তা হলেই বা আপনি কি বুঝবেন?—একথা বলিয়াই তিনি একটি দুর্ব্বোধ্য ল্যাটিন ঔষধের নাম করিয়া বলিলেন—কি, বুঝলেন কিছু?

গিরীশ বাবু ততক্ষণে কৃতকর্ম্মের জন্য যৎপরোনাস্তি অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছেন। ডাক্তারের কিন্তু সেদিকে খেয়াল নাই। তিনি বলিয়া চলিলেন—তবে, তবে কেন এত সব বাজে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন! উত্তেজিত ভাবে প্রবীণ চিকিৎসাবিদ সেদিন রোগীর কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

গিরীশবাবুর আচরণে ত্রুটি ছিল সত্য, কিন্তু ডাঃ সরকারের এ উত্তেজিত আচরণে আমি মনে অত্যন্ত ব্যথা পাইলাম। ডাঃ সরকার সম্পর্কে যেমন শ্রদ্ধা ছিল তেমনি গিরীশবাবুর প্রতিও একটি স্বাভাবিক ভালবাসা ছিল। সেজন্যই বোধ হয় দুইজনের·মধ্যেকার এই তিক্ততা আমার মনে একটা মর্ম্মান্তিক বেদনা জাগাইয়া তুলিল। কোন যুক্তিতর্ক দিয়াই মনকে শান্ত করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, গিরীশবাবু সাধারণ স্তরের মানুষ, তাঁহার তো ভুল ত্রুটি থাকিবেই, কিন্তু মহেন্দ্রবাবু তো এ ত্রুটি ক্ষমা করিতেও পারিতেন!

ডাক্তার সরকারের সেদিনকার আচরণে আমার মনটি তাঁহার উপর বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল। কেবল ভাবিতে থাকি, তাঁহার এই ত্রুটি সংশোধিত হওয়া উচিত, আমিই তাঁহাকে এ সম্পর্কে চিঠি দিব। তরুণ বয়স—রক্ত চঞ্চল, সুতরাং

সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিতে বেশী সময় লাগিল না।

মহেন্দ্রবাবুর উদ্দেশে বাংলায় একটি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া ফেলিলাম। তাঁহার মত উদার ও মহৎ চরিত্রের ব্যক্তির পক্ষে এ জাতীয় আচরণ যে অবাঞ্ছনীয়, ইহাই ছিল এ পত্রের মর্ম্ম। প্রাণের আবেগে পত্রটিতে আমার মনোবেদনা জানাইয়া দিলাম। সেই উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত্তে ক্ষণেকের জন্য মনে হইল না যে, ডাক্তার সরকারের মত একজন স্বনামধন্য ও কৃতী পুরুষের সংশোধনার্থ এ জাতীয় স্পর্দ্ধাপূর্ণ উক্তি আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। তাঁহার ত্রুটি সম্পর্কে উল্লেখ করিতে গিয়া আমি নিজেও যে সেই মাত্রাহীন আচরণই দেখাইতেছি, সে কথা চিন্তা করিবার মত অবসর আমার তখন হয় নাই। দীর্ঘ পত্রখানির সহিত ইংরাজি ভাষায় আমার রোগের ইতিহাস ও উপসর্গগুলিও লিখিয়া রাখিলাম।

পরদিন ডাক্তার সরকার আবার আসিলেন। তাঁহাকে রোগ-বিবরণীর সহিত পত্রখানি দিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমার মানসিক উত্তেজনা শান্ত হইয়া গেল। ডাক্তারের গাড়ীটি পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া যাইবার পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল—ইহা কি সমীচীন হইল? আমার মত পরনির্ভরশীল দরিদ্র সন্তানের পক্ষে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে এ জাতীয় পত্র লেখা শুধু অপরাধই নয়—এ যেন এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ। পত্রের প্রতিক্রিয়ার ফলে আমার ভাগ্যে যে এখানকার আশ্রয়ত্যাগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে তাহাও বুঝিলাম। সামান্য অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্ত্তাই যিনি সহিতে পারেন না তাঁহার পক্ষে এ চিঠি বিস্ফোরণের কার্য্য না করিয়া পারিবে না। তিনি এ পত্র সম্পর্কে মহেশবাবুকে জানাইলেই এ গৃহের দ্বার আমার সম্মুখে চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু বিস্ময়ের সহিত সেদিন ইহা লক্ষ্য করিলাম যে, সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চিরাচরিত পথ বাহিয়া চলে না। আমার ঔদ্ধত্যের পটভূমিকায় অতঃপর মহেন্দ্রলাল সরকারের যে ক্ষমাসুন্দর মহান চরিত্রটি ফুটিয়া উঠিল তাহার তুল্য ঘটনা মানুষের এ ধূলিমলিন সংসারে বেশী ঘটিতে দেখা যায় না।

ডাক্তার সরকারকে এরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্র দিবার পর হইতেই বিবেকের দংশনে ও অশান্তির মধ্যে দিন কাটাইতেছি। এ ঘটনার ঠিক দুইদিন পরে, একদিন সকালে আমার কক্ষে বসিয়া পড়িতেছি। এমন সময় খবর পাইলাম, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার নাকি কেবলমাত্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্যই এ বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন। বুঝিলাম, পত্রের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং ইহার শেষ অধ্যায়টি এখনই সমাপ্ত হইবে। ইহার ফলে চৌধুরী গৃহের দরজাও যে আজ আমার সম্মুখে চিরতরে বন্ধ হইবে, তাহা বুঝিতে দেরী হইল না। ডাক্তার সরকারের সহিত আসন্ন সাক্ষাতের ও তাহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। আমার অশোভন আচরণের কথা জানাজানি হইলে এ

পরিবারের প্রত্যেকের সহানুভূতি যে আমি হারাইব, তাহাও তখনি বুঝিতে পারিলাম। যে ব্যক্তি ডাকিতে আসিয়াছিল সে আমার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া বলিল—ডাক্তারবাবু দেখছি তোমার প্রতি খুব আকৃষ্ট। কি ব্যাপার বল তো ?

বিস্ময়ের সহিত তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া বলিলাম—কিসে তোমার এ ধারণা জন্মালো ?

—ডাক্তারবাবুর মত কর্ম্মব্যস্ত লোক শুধুমাত্র তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই কাজ ফেলে আমাদের বাড়ী এসেছেন, এতো যে সে কথা নয়। তাছাড়া, কাকা যখন ডাঃ সরকারকে বললেন—কি ডাক্তারবাবু! সে পাগল দেখি আপনাকে এতদূর টেনে এনেছে।

তিনি একটু হেসে উত্তর দিলেন—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি বাঙ্গলার ঘরে ঘরে যেন এমন পাগলই জন্মায়।

ব্যাপার যে বাস্তবতঃ কি ঘটিতেছে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এ পর্য্যন্ত নিজের আচরণ ও কর্ম্মের সহিত ডাঃ সরকারের প্রতিক্রিয়ার একটা যুক্তিসম্মত যোগাযোগ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু বন্ধুর কথায় সে হিসাবে গণ্ডগোল হইয়া গেল। দ্বিধা শঙ্কিতচিত্তে বসিবার কক্ষের দিকে রওনা হইলাম। দরজার সামনে যাইতেই ডাঃ সরকার নিজ আসন ছাড়িয়া আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। সাগ্রহে করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন—তোমার অসুখের বিস্তারিত বিবরণী পেয়ে সব জেনেছি, আর তোমার বাঙ্গলা পত্রখানির জন্য তোমায় অশেষ ধন্যবাদ দিই।

আমার অবস্থা তখন সহজেই অনুমেয়। কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কিছুটা চেষ্টা করিতে গিয়া থামিতে হইল। তাঁহাকে এরূপ পত্রাঘাত করা যে আমার পক্ষে গুরুতর অপরাধ হইয়াছে ইহা শুনিতে তিনি কোন মতেই রাজী নহেন। আমার কথার মাঝেই বলিয়া উঠিলেন—ক্ষমা আবার কি ? তুমি কি অপরাধ করেছ যে ক্ষমা করবো ? আর তুমি কি ভাবছো, তোমায় ক্ষমা করার জন্যই এত সময় নষ্ট করে আমি এসেছি ? আমি তোমাকে আমার গাড়ী করে বাড়ীতে নিয়ে যেতে এসেছি। তুমি কি এখন আমার সঙ্গে যেতে পারবে ? তুমি আমায় যে বিষয় নিয়ে পত্র লিখছ সে সম্পর্কেই তোমার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। গাড়ীতে বসেই কথাবার্ত্তা হবে।

ডঃ সরকারের কথাগুলি কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু অর্থ যেন বোধগম্য হইল না। ভাবিয়া পাইলাম না, তাঁহার মত রুক্ষ প্রকৃতির মানুষ এরূপ পত্র পাইয়া ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্ত্তে এত খুশী হইয়া উঠিলেন কেন ? দ্বিধাবিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

তিনি পুনরায় বলিলেন—কি হে, আমার সঙ্গে গেলে তোমার এখন অসুবিধে হবে নাকি ?

আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহার গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। ঘটনাটি যে কেবল আমাকেই বিস্মিত করিয়াছিল তাহা নয়, সেদিন আমার প্রতি তাঁহার এ অহেতুক অনুরাগ চৌধুরী পরিবারের প্রত্যেককেই চমৎকৃত না করিয়া পারে নাই।

গাড়ী চলিতে থাকিলে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—দেখ আজকালকার প্রত্যেকটি বাঙ্গালীর মধ্যে স্বাদেশিকতা ও আত্মসম্মানবোধ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দেশে বহু ভাল চিকিৎসক আছেন, তৎসত্ত্বেও তাঁরা বিদেশী চিকিৎসকদের সম্পর্কে আস্থাবান। তাঁদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ডেকে আনেন, তবুও বাঙ্গালী চিকিৎসককে ডাকেন না এটা বড় লজ্জাকর ব্যাপার!

আমার মনে কিন্তু তখন সেই একই প্রশ্ন ঘুরিতেছে—ডাক্তার সরকার আমার পত্র পাইয়া কি মনে করিয়াছেন কে জানে? ঔৎসুক্যভরে প্রশ্ন করিলাম—আপনাকে রূঢ়ভাবে পত্র দিলেও, গিরীশবাবুর সেদিনের ব্যবহার যে সৌজন্য-বহির্ভূত হয়েছিল সে সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কিন্তু আপনার ব্যবহারে আমি সত্যই ব্যথা পেয়েছিলাম। আপনি সাধারণ মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করতে পারবেন না, এ যেন আমি চিন্তা করতেই পারিনে। আপনার সেদিনের উক্তি গিরীশবাবুকে কতটা চঞ্চল করেছিল জানিনা, কিন্তু আমি যে বেদনা পেয়েছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারিনে। আপনাকে পত্র দিই সেই বেদনাহত মন নিয়েই। অবশ্য পত্রখানি আপনার হাতে তুলে দেবার পর থেকেই অনুতাপে পুড়ে মরছি।

ডাক্তার সরকার আমার কথাগুলি খুব মনোযোগ সহকারে শুনিলেন, তারপর মাথা নাড়িয়া বলিলেন—তুমি ঠিকই বলেছ, আমি সেদিন অশোভন-ভাবেই রূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। পরে আমি আমার ভ্রম বুঝতে পেরে গিরীশ-বাবুর নিকট অপরাধ স্বীকার করেছি।

কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে গাড়ীখানি তাঁহার গৃহের সম্মুখে আসিয়া থামিল। ডাঃ সরকার আমাকে লইয়া তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর হাসিয়া বলিলেন—তোমায় কেন আনলাম জানো? পত্রের ভেতর তোমার যে স্পষ্টবাদিতা ও সৎসাহসের পরিচয় পেলাম তাতে আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—এ সাহস ও সততা নিয়ে জীবনে তুমি স্বপ্রতিষ্ঠ হও।

বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম—শ্রদ্ধায় আমার মাথা তাঁহার পায়ে নত হইয়া আসিল। একটি অপরিণত যুবকের নিকট হইতে নিজ আচরণের এরূপ তীব্র সমালোচনা শুনিয়াও যাঁহার চিত্তে বিন্দুমাত্র তিক্ততা দেখা দেয় নাই, তিনি যে কত বিরাট ও উদার সেদিন তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলাম। এ ঘটনাটির সূত্র ধরিয়াই তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা

বাড়িয়া উঠে। তিনিও ইহার পর হইতে আমায় অত্যন্ত স্নেহ করিতে থাকেন।

প্রতিভার সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে উহার ব্যাপকতা। উহা কখনও সীমারেখা ধরিয়া চলে না। ডাঃ সরকারকে দেখিয়া এই সত্যটি যেন বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি নিজে ছিলেন চিকিৎসক, কিন্তু তাঁহার গৃহটি ছিল শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক মর্ম্মকেন্দ্র। তাঁহার গৃহ সম্মিলনীতে যোগ দিতে না পারিলে অনেকেরই ক্ষোভের সীমা থাকিত না। কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যে এমন সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে পারেন তাঁহাকে না দেখিলে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। সকাল সন্ধ্যায় কেবল তাঁহার কথা শুনিবার জন্যই বহু লোক সে গৃহে সমবেত হইতেন। তিনিও সকল সময়ই সাধারণের পক্ষে সহজ গ্রাহ্য হইয়াই কথাবার্ত্তা বলিতেন।

সে সময়টা ছিল ১৮৬৯-৭০ সাল। আমি অতঃপর ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করি এবং বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ডাঃ সরকারের নিকবর্ত্তী এক গৃহে উঠিয়া আসি। সুতরাং ঘটনাচক্রে তাঁহার সান্নিধ্যলাভের সুযোগটি ঘটিয়া যায়।

সে সময়ে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালীর গৃহে পূর্ব্বোক্ত ধরণের সামাজিক বৈঠক বসিত। ইহার মধ্যে তৎকালীন সাময়িক পত্রিকা, হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক বাবু কৃষ্ণদাস পাল ও ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেন মহাশয়ের গৃহের বৈঠকের নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এদুটিতে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদেরই যাতায়াত ছিল বেশী। কিন্তু ডাঃ সরকারের গৃহের বৈঠকটি সত্যই এক সর্ব্বজনীন মিলন কেন্দ্র ও জ্ঞানাহরণের ক্ষেত্ররূপে পরিচিত হইয়া উঠে।

ডাক্তার সরকার নিজেই ছিলেন জ্ঞান বিতরণের প্রকাণ্ড আধার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জ্ঞাতব্য তথ্য তাঁহার কণ্ঠস্থ থাকিত এবং তাঁহার কথা শুনিলেই বহু তথ্য আহরণ করা যাইত। এরূপ একনিষ্ঠ জ্ঞানসাধক আমি আমার জীবনে বড় বেশী দেখি নাই। তাঁহার জীবনটি ছিল পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতীক।

জ্ঞান সঞ্চয়নকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার গৃহে একটি মূল্যবান গ্রন্থাগারও গড়িয়া উঠে। এই গ্রন্থাগারটি ছিল ডাঃ সরকারের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়বস্তু। তিনি প্রায়ই সেখানে আমায় লইয়া যাইতেন এবং গ্রন্থগুলি দেখাইয়া বিভিন্ন বিষয়-বস্তুর আলোচনা করিতেন। আমার নিকট তাঁহার এই গ্রন্থাগারটির আকর্ষণ ছিল অত্যধিক।

আমি অনেক জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তি দেখিয়াছি কিন্তু তাঁহার মত এমন জ্ঞানের পাগল দেখি নাই। পুস্তকের জন্য সকল শ্রম সহিতে তিনি সম্মত ছিলেন। এই গ্রন্থাগারটি তৎকালে একটি অমূল্যসম্পদরূপেই পরিগণিত হয়, কলিকাতায় ডক্টর আশুতোষ মুখার্জ্জি ব্যতীত আর কাহারও এরূপ বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল

বলিয়া আমার জানা নাই।

সংসারের মানুষ স্রষ্টার কথা ভুলিয়া গিয়া সাধারণতঃ সর্ব্ব কর্ম্মে নিজের শক্তির উপরেই গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। কিন্তু ডাঃ সরকার সম্পূর্ণ এক ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। চিকিৎসাশাস্ত্রের মত জড়বিজ্ঞান লইয়াই তাঁহার জীবন কাটিয়াছে, তথাপি তাঁহার সদা জাগ্রত মনটি কোন সময়ই জড়বাদী হইয়া পড়ে নাই। তিনি সকল সময় সকল কর্ম্মের মধ্যে স্রষ্টার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেন। আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটনায় ডাঃ সরকারের এই সাধক মনটির প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করি।

এক সময়ে আমার স্ত্রীর গর্ভে একটি অসুস্থ ও অপরিণত কন্যা জন্মগ্রহণ করে। আমি ডাঃ সরকারের নিকট সে কথা উত্থাপন করিতেই তিনি সাগ্রহে কেসটি নিজের হাতে লইলেন। এ সময়ে প্রতিদিন রোগীর অবস্থার বিবরণ দিবার জন্য তাঁহার নিকট যাইতে হইত।

একদিন কন্যার সংকটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইয়া ডাক্তার সরকারের নিকট উপস্থিত হই। আমার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি মেলিয়া হঠাৎ তিনি সস্নেহে বলিয়া উঠেন—আচ্ছা শিবনাথ, তুমি তো ধার্ম্মিক লোক। প্রার্থনাতেও তো তোমার অগাধ বিশ্বাস আছে। তবে তুমি কেন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর না যে, তোমার যেন আর সন্তানাদি না জন্মে। জান তো, বহু সন্তান মহা দুঃখের কারণ!

তাঁহার মুখে এ জাতীয় কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে তো হাসিয়াই অস্থির।

আমি সসঙ্কোচে তাঁহাকে বলিলাম—আমি আপনাকে বোধহয় খুব কষ্ট দিচ্ছি।

ডাঃ সরকার শান্ত স্বরে বলিলেন—না হে, আমার দুঃখের কথা চিন্তা করে এ কথা আমি বলিনি। এতে আমার আর কষ্ট কি? বাড়ী থেকেই নির্দ্দেশ দিই, মাঝে মাঝে হয়ত দু'একবার তোমার বাড়ী যাই। কিন্তু প্রতিদিন তোমার উদ্বেগ-ক্লিষ্ট মুখখানা দেখে সত্যই আমি ব্যথা পাই।

আমি বলিলাম—শিশুটিকে রোগমুক্ত করবার কোন চেষ্টাই ফলপ্রসু হচ্ছে না, এটাই আমায় মানসিক ক্লেশ দিচ্ছে।

ডাঃ সরকার স্মিত হাস্যে বলিলেন—যে বস্তু তোমার আয়ত্তের বাইরে তার দায়িত্ব নিয়ে কষ্ট পাও কেন? যা কিছু এ ক্ষেত্রে করবার তা তো তুমি করছো, এ ভেবেই তুমি সন্তুষ্ট থাক। ফলাফলের চিন্তায় লাভ কি? তা তো তোমার হাতে নেই—সে ভার ঈশ্বরের ওপর ছেড়ে দাও। আমি তো তোমাকে বহুবার বলেছি যে, শেষ ফলাফল বা পরিণতি মানুষের আয়ত্তের বাইরে। একথা আমি শুধু মুখেই বলিনে, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাসও করি। তুমিই চিন্তা করে

দেখ, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বা বিশ্বাস যদি সুখে দুঃখে মানুষের চিত্তে এটুকু স্বস্তি বা নির্ভরতা আনতে না পারে, তবে কি প্রয়োজন সে বিশ্বাসে ?

ডাঃ সরকারের মুখের দিকে তাকাইয়া বুঝিলাম, ইহা কেবলমাত্র তাঁহার মুখের কথা নহে, ইহা তাঁহার জীবন দর্শন। সুপ্রতিষ্ঠিত, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সমস্ত জীবন প্রবাহটি যে ভগবৎ-ইচ্ছার স্রোতে মিলিয়া গিয়াছে ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

বুঝিলাম, জীবনে ধর্ম্ম-আন্দোলন করিয়াছি কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে ধর্ম্মকে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি নাই।

যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই যেন আমি ডাক্তার সরকারের একান্ত অনুরাগী হইয়া পড়িতে লাগিলাম। লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহার জীবন সাধনার ক্ষেত্রটি এতই উদার ও প্রশস্ত যে, যে কোন বিষয়ী ব্যক্তিও সেখানে গমন করিলে সাময়িকভাবে বিষয় চিন্তা বিস্মৃত না হইয়া পারে না। জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি জীবনে বহু দেখিয়াছি কিন্তু তাঁহার মত এরূপ প্রেরণা দানে সক্ষম ব্যক্তি বড় অধিক দৃষ্ট হয় নাই।

তাঁহার প্রতিটি কথাই বাস্তব জগতের তিক্ততা হইতে মুক্ত ছিল। তিনি যখন অতি সাধারণ বিষয় লইয়া আলাপ আলোচনা করিতেন সে সময়ও লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহার কথা মানুষের মনকে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি বা গ্লানি হইতে মুক্ত করিয়া উচ্চতর জীবনের স্তরে টানিয়া তুলিয়াছে। কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া শ্রোতাকে তিনি নৈতিকতার উচ্চতর স্তরে উন্নীত করিতে পারিতেন—অথচ সে সময় কলিকাতার প্রতিটি সামাজিক বৈঠকেই ধর্ম্মীয় বিরোধের বিষোদ্গীরণ চলিতেছে। তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার ইহাও একটি প্রধান কারণ।

মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের অনাড়ম্বর জীবনের ধারাটিও বিশেষভাবে আমার মনকে তখন আকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার জীবনযাত্রা কেবলমাত্র আড়ম্বরশূন্যই ছিল না, তাহা দেশ-প্রেমেরও পরিচায়ক ছিল। সেদিনের বৈদেশিক সভ্যতার প্রভাবের যুগেও কেহ কোনদিন তাঁহাকে ধুতিচাদর ও ও তালতলার চটি ব্যতীত অন্য কোনরূপ বেশভূষা ব্যবহার করিতে দেখে নাই। প্রকাশ্য সভাসমিতি হইতে রোগীর কক্ষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এই পরিচ্ছদেই তিনি যাতায়াত করিতেন। তাঁহার মতে বুট বা অন্য যে কোন প্রকার উঁচু গোড়ালিওয়ালা জুতা পরিলে পদের সম্মুখাংশে শরীরের ভার বেশী পড়ে, দীর্ঘদিন এইভাবে ভার পড়িলে কালক্রমে স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যায়। এ মতবাদটি তিনি আমার বন্ধু বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির পিতা, অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ দুর্গাচরণ ব্যানার্জ্জির নিকট হইতে শুনেন এবং ইহা তাঁহার নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

ডাঃ সরকারের পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহাকে শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না বরং একজন সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়াই ভ্রম হইত। আহারাদি সম্পর্কেও তিনি অত্যন্ত সংযমী ও মিতাচারী ছিলেন। প্রচুর উপার্জ্জন করিলেও তাঁহার জীবনধারণের ব্যয় ছিল নিতান্ত অল্প এবং উদ্‌বৃত্ত অর্থে তিনি প্রচুর গ্রন্থ ক্রয় করিতেন।

তাঁহার সততা ও স্পষ্টবাদিতা দেখিয়া অবাক না হইয়া পারা যাইত না। তিনি কখনও কাহাকেও মিথ্যা সান্ত্বনাদ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন না। যত অপ্রিয়ই হউক, সত্যপ্রকাশে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। নিজে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, বা গ্রহণ করিতেন তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রিয়তম বস্তুকে ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। সত্য রক্ষার্থে ডাঃ সরকার জীবনে বহুবার বহু ক্লেশ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। একটি মানুষের মধ্যে এতগুলি সদ্‌গুণের প্রকাশ অতি অল্পই দেখা যায়।

মানুষের দোষ ত্রুটির বিরুদ্ধে রূঢ় আঘাত হানিলেও তিনি কিন্তু মানুষটি সম্পর্কে কখনই বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতেন না। যাহার সম্পর্কে যেটুকু বক্তব্য তিনি স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়া দিতেন, তারপর সে সম্বন্ধে আর কোন চিন্তা তাঁহার চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিতে পারিত না। তাঁহার এই সর্ব্ব আবিলতা-মুক্ত সাধক মনটি আমার চিত্তকে ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়া লইয়াছিল।

আমি সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নের আলোচনায় আগ্রহশীল ছিলাম জানিয়া মহেন্দ্রবাবু অধিকাংশ সময়ই আমার সহিত সেই সম্পর্কিত বিষয়েই আলাপ-আলোচনা করিতেন। এই জ্ঞানবৃদ্ধের পাঠকক্ষে বসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনায় যে কতদিন কাটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একদিনের আলোচনার কথা আজিও আমার মানসপটে জাগরূক রহিয়াছে। ডাক্তার সরকার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মানিতে রাজী নন, কিন্তু আমি আবার এরূপ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বেশী আস্থাবান। কথাপ্রসঙ্গে একদিন এ বিষয়ে বিতর্ক আরম্ভ হইল।

ডাঃ সরকার বলিলেন—দেখ শিবনাথ, আমার মনে হয় দলীয় ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান অথবা মঠ মন্দির এগুলি ধর্ম্মপথের তেমন সহায়ক নয়, বরং অন্তরায়। কারণ, ধর্ম্মবস্তুটি প্রকৃত পক্ষে বাহ্যিক কিছু নয়, ওটা সম্পূর্ণ রূপে মানুষের মনোলোকের অন্তর্গত। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কাউকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী করে তোলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে মানুষ ধর্ম্মের সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। আরও এও সত্য—সৎ নীতিনিষ্ঠ এবং শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই এ বিশ্বের স্রষ্টার মহিমা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। সুতরাং প্রতিষ্ঠান গড়ে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার অথবা তা' দ্বারা বিশ্বাস জাগরিত করবার সত্যিই কোন প্রয়োজন হয় না। আমার তো ধারণা,

প্রতিষ্ঠান গঠন করে ধর্ম্মপ্রচারের ফলে শুভ অপেক্ষা অশুভ প্রতিক্রিয়া বেশী দেখা যায়। দলীয় প্রচার মানুষের মধ্যে ভেদ-বিবাদ সৃষ্টি করে। ফলে, একই ধর্ম্ম হতে বহু দলের সৃষ্টি হয় ও পরিণামে সাম্প্রদায়িক দলাদলির বিষ ছড়ায়, আর এতে সমাজ-দেহে ক্ষতের সৃষ্টিও কম করে না। ধর্ম্ম মানব চরিত্রের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি। সুতরাং একে কৃত্রিমভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

আমি বলিলাম—ধর্ম্ম যে মানবমনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি এ আমি অস্বীকার করিনে, কিন্তু মানুষের মনের স্বভাবজ সকল বৃত্তিগুলিই উন্নয়ন সাপেক্ষ। শিশু যে সব বৃত্তি ও সংস্কার নিয়ে পৃথিবীর মাটিতে আসে—শিক্ষা, সংস্কার, অধ্যবসায় প্রভৃতির দ্বারা সেগুলোকে পরিবর্দ্ধিত বা সংশোধিত করলে তবে সে পরিণত বয়সে সার্থক নাগরিকরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে! ধর্ম্ম সম্পর্কেও কি সেই নিয়মেই প্রযোজ্য নয়? মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত ধর্ম্মবোধকে জাগ্রত ও বিকশিত করবার জন্যই উপযুক্ত মনন, নিয়মানুষ্ঠান, পূজাপদ্ধতি ও ধর্ম্মপথের নির্দ্দেশাদি রয়েছে। শুধু ধর্ম্ম কেন, মানব-মনের কোন বৃত্তি ও প্রবণতাই বাহ্যিক নয়, তা অন্তরের বস্তু। তবু কেন মানুষ জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে ও বিশেষ প্রতিষ্ঠানে যায়? তাহলে তো কোন বৃত্তিরই উন্নতি সাধনের প্রয়োজন নেই! আর তাই যদি হয় তবে আপনিই বা সায়েন্স অ্যাসোশিয়েশন প্রতিষ্ঠার জন্য এত পরিশ্রম কচ্ছেন কেন? আমাদের সকল প্রবৃত্তিরই যদি সংস্কার ও উন্নতি সাধনের প্রয়োজন হয়, তাহলে ধর্ম্মের মত এমন একটি অতি প্রয়োজনীয় বৃত্তির বিকাশের জন্য কি কোন শিক্ষারই প্রয়োজন নেই বলতে চান? ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান, ধর্ম্ম বিষয়ে পথনির্দ্দেশের কেন্দ্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাছাড়া, আপনি যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির কথা বলছেন তা কেবল ধর্ম্মকে কেন্দ্র করেই বেড়ে ওঠে না। জীবনের বিভিন্নমুখী চিন্তাধারা মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই মতানৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করে! এটাও মানব-মনেরই একটি বিশেষ প্রবণতা!

আরও বলিয়া চলিলাম—দলীয় মনোবৃত্তি কি কেবল ধর্ম্মের ভিত্তিতেই গড়ে উঠে বলতে চান? তবে আপনাদের চিকিৎসা-বিজ্ঞান জগতে এত দলাদলি কেন? হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসকদের মধ্যে এরূপ মতভেদ হয় কি জন্যে? আপনার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তো জানেন, আপনার অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক বন্ধুদের সহিত মতানৈক্যের ফলস্বরূপ কিরূপ নির্য্যাতন আপনাকে ভোগ করতে হয়েছে। সেখানে তো ধর্ম্মের প্রশ্ন ছিল না তবু এমন দলাদলি হল কি করে? কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। সঙ্কীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধি মানুষের অজ্ঞ মনের অভিব্যক্তি! কেবল ধর্ম্ম কেন, যে কোন বস্তুকে কেন্দ্র করেই তা মানব-মনে জন্মে থাকে। মানুষ প্রকৃত শিক্ষা

পেলে, নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করতে শিখলে ধীরে ধীরে সে ভেদবুদ্ধি দূর হয়ে যায়।

আমার কথাগুলি শুনিয়া ডাঃ সরকার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর তিনি বলিলেন—তোমার কথাগুলো সত্যই যুক্তিযুক্ত। আমি এ সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা না করেই তোমার সাথে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। আচ্ছা, আজ এ প্রসঙ্গ থাক,এ সম্পর্কে চিন্তা ক'রে আমি আর একদিন আলোচনা করবো।

ইহার পরই আমি কার্য্যান্তরে কিছুকালের জন্য কলিকাতা ত্যাগ করি। সুতরাং বর্ত্তমান প্রসঙ্গটি আর আলোচিত হয় নাই।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আমি গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ডাঃ সরকারের শরণাপন্ন হই। আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি সত্বর আসিয়া উপস্থিত হন ও চিকিৎসার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তখন অ্যালোপ্যাথি ছাড়িয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ধরিয়াছেন। কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজনের হোমিও-প্যাথি চিকিৎসা সম্পর্কে মোটেই কোন আস্থা নাই। তাঁহারা সকলেই আমায় অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইবার জন্য বলিতে থাকেন—এমন কি আমার মাতাঠাকুরাণীও এ সম্পর্কে আত্মীয়দের মতই সমর্থন করেন। কিন্তু আমি সকল বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া ডাঃ সরকারের চিকিৎসাধীন থাকিতেই মনস্থ করিলাম। তিনিও পুত্রাধিক স্নেহে আমার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিছুকালের মধ্যেই আমি সুস্থ হইয়া উঠিলাম।

পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে ডাঃ সরকারের স্নেহশীল ও একনিষ্ঠ মনের যে কত পরিচয় পাইয়াছি তাহার তুলনা নাই। ১৮৮১—৮২ সালে আমার একটি কন্যা টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়। প্রথমে আমার একটি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বন্ধু তাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যাধি গুরুতর আকার ধারণ করে এবং আমি ডাক্তার সরকারকে ডাকিতে যাই। এতদিন খবর না দেওয়ায় তিনি আমায় বহু তিরস্কার করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আমার সহিত চলিয়া আসিলেন। শত কাজ থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রতিদিন আমার গৃহে সকাল সন্ধ্যায় আসিতেন, কেহ কোনদিন ইহার ব্যতিক্রম দেখে নাই।

আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াই তিনি কন্যার অবস্থা দেখিয়া প্রয়োজনমত ব্যবস্থাদি করিতেন এবং রোগ বিবরণ লিখিয়া লইতেন। দুই বেলায়ই প্রায় ঘণ্টাখানেক করিয়া আমার বাড়ী বসিয়া রোগিণীর অবস্থা লক্ষ্য করিতেন। তাহার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকিলে অনেকে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার জন্য আমায় বলিতে থাকেন, কিন্তু ডাঃ সরকারের উপর আমার অসীম আস্থা। আমি তাঁহার উপরই নির্ভর করিয়া রহিলাম।

রোগিনীর সংকটজনক অবস্থা বুঝিয়া একদিন আমার এক ব্রাহ্ম চিকিৎসক বন্ধুকে তিনি তাহার নিকট থাকিতে বলেন। বন্ধু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন —আমার একটি বিশেষ কাজ আছে তাই কথা দিতে পারছিনে, তবে আসবার চেষ্টা করবো।

এ কথা শুনিবা মাত্র ডাঃ সরকার তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—বন্ধু হয়েও তুমি যদি এটুকু করতে না পার, তবে আমি প্রতিদিন ঠিক সময়ে আসি কোন্ যুক্তিতে? তাছাড়া একজনের জীবন-মরণের সমস্যা অপেক্ষা কি তোমার অন্য কাজের প্রয়োজনীয়তা বেশী বলে মনে কর? ওসব কাজ থাক, তুমি অন্য কাজ রেখে কাল অতি অবশ্য আসবে।

ডাঃ সরকারের তিরস্কারে বন্ধুটি অন্য কাজকর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করিয়া আমার গৃহে আসিয়াছিলেন। ডাঃ সরকারের সহায়তায় আমার কন্যাটি সে যাত্রা রক্ষা পায়।

জীবনে আর একবার তাঁহার সস্নেহ ব্যবহার পাইয়াছি যাহা কখনই ভুলিতে পারিব না। আমি তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকার্য্যে মাদ্রাজ অঞ্চলে ঘুরিতেছি। উহা খুব সম্ভবতঃ ১৮৯১ সাল হইবে। সঙ্গে আমার সঙ্গী বা সহকারী কেহই ছিল না। গোদাবরী জেলার অন্তর্গত কোকনদ বন্দরে হঠাৎ আমি অসুস্থ হইয়া পড়ি। যাঁহাদের গৃহে উঠিয়াছিলাম তাঁহারা যথাসাধ্য সেবাযত্নের ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু বড় সমস্যা দেখা দিল চিকিৎসক লইয়া। সেখানে কোন ভাল চিকিৎসক না থাকায় চিকিৎসা বিভ্রাট দেখা দিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি গৃহস্বামীকে সেখানকার এক বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথকে ডাকাইতে বলি এবং চিকিৎসক উপস্থিত হইলে তাঁহাকে আমার সমস্ত উপসর্গ জানাইয়া কলিকাতায় ডাঃ সরকারের নিকট তার করিতে অনুরোধ করি।

পরে আমার এক বন্ধুর নিকট শুনি যে, টেলিগ্রামটি পড়িয়া ডাঃ সরকারের দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা নামিয়া আসে। তিনি বলিয়াছিলেন—হায়! বিদেশ বিভূঁইয়ে সে অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে অসহায়ভাবে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবে?—যা হোক, সে যাত্রা আমি রক্ষা পাইয়া ফিরিয়া আসি ও প্রথমেই ডাক্তার সরকারের গৃহে দেখা করিতে যাই। আমাকে তিনি গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বলিলেন—এ যাত্রা তুমি যে আবার ফিরে এসেছ, এজন্য ভগবানকে কি ধন্যবাদ দেব জানিনে। মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি আনন্দে তাঁহার দুই-গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।

আসিয়া নূতনতর প্রেরণা লাভ করিয়াছে।

তাঁহার গ্রন্থাগারটি ছিল আমাদের মধ্যেকার সংযোগস্থল। দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা, সামাজিক সংস্কার, ধর্ম্ম আন্দোলন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত আলোচনা করিতাম, পরামর্শ লইতাম। তাঁহার বিচার ও মীমাংসা সম্পর্কে আমার বিশেষ আস্থা ছিল। অপ্রিয় সত্য বলিতে তিনি কোন সময়েই দ্বিধাবোধ করিতেন না, তাছাড়া, তাঁহার মতামত সকল সময়ই ব্যক্তিগত স্বার্থবোধশূন্য ছিল। যদিও পারিপার্শ্বিকতার জন্য সকল ক্ষেত্রে তাঁহার সব মতামত বা প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইত না তবু ইহা জানিতাম যে, তাঁহার প্রস্তাব কোন দলীয় পক্ষপাতদুষ্ট নয়।

ডাঃ সরকার প্রকৃত সাধক ছিলেন। কিন্তু সম্প্রদায় গঠন, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার আস্থা ছিল না। রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে রামমোহন রায় তাঁহার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। সংরক্ষণশীলতা তিনি কোন সময়ই পছন্দ করিতেন না, এই জন্যই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সম্পর্কে সকল সময়ই তাঁহার নিকট হইতে ব্যঙ্গোক্তি শোনা যাইত।

একবাব অ্যালবার্ট হলের কোন সভায় একজন হিন্দু-ধর্ম্মভাবাপন্ন বিদেশিনী মহিলা মূর্ত্তিপূজার অনুকূলে একটি ভাষণ দেন। ইহার উত্তরে ডাঃ সরকার উদাত্তকণ্ঠে এক বক্তৃতা দিয়া ফেলেন—প্রথম কথাকয়টি আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। পরিহাসপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বলিতে লাগিলেন—সাগরপার হইতে এক বিদেশিনী আসিয়া পৌত্তলিকতা লইয়া সুপারিশ আরম্ভ করিলেন এবং তাহা দেখিবার জন্য ভগবান আমাকে দীর্ঘদিন জীবিতও রাখিলেন—অদৃষ্টে আরও কত কি আছে কে জানে!—শ্রোতৃমণ্ডলী ডাঃ সরকারের সরস বাচনভঙ্গীতে হাস্য করিতে থাকেন।

ডাঃ সরকারের রসবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ন ছিল। একদিনের ঘটনা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। সে সময় আমার কন্যার খুব অসুখ। আমি তখন ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের নিকটেই বাস করিতেছি। প্রথম দিন দেখা হওয়ার পর প্রথমেই তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন—জান তো! ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, গীর্জ্জার যত নিকটে বাস করবে, ঈশ্বর থেকে ততদূরে সরে যাবে। তুমি এ কি করেছ হে? আর জায়গা পেলে না, শেষ পর্য্যন্ত সমাজ মন্দিরের পাশে এসে বাস করলে? এখনও সময় আছে, অন্যত্র সরে যাও, নইলে শেষ পর্য্যন্ত সমাজের দরজা আগলানোই সার হবে।—ইহা বলিয়াই উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

আর একদিনের কথা। ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেন তখন অসুস্থ। ডাঃ সরকার ও ডাঃ দুর্গাচরণ ব্যানার্জ্জীকে তাঁহার গৃহে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। দুইজন

চিকিৎসকই রোগীকে একতলা হইতে দোতলায় লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিলেন। তখনই তাঁহাকে উপরে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ডাঃ সরকার ও ডাঃ ব্যানার্জ্জি ধরাধরি করিয়া কেশববাবুকে উপরে তুলেন। ডাঃ সরকার কেশব বাবুর মাথাটি ধরেন। এই ঘটনার অনেকদিন পরে একদিন ব্রাহ্মসমাজে গুরু-পূজা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইলে ডাঃ সরকার বলেন—আমি কিন্তু কেশববাবুর মাথাটিই ধরেছিলাম, হৃদয়ের খবর বলতে পারিনে।

তাঁহার এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে চাহিলে তিনি বলেন—ধর্ম্ম-জগতেও অপরের শ্রদ্ধাভক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা এবং তা পাওয়ার গৌরব মানুষের হৃদয়ে অনেকখানি আলোড়নের সৃষ্টি করে। সেজন্যই বলছি, যশ ও প্রতিপত্তিলাভে তাঁর হৃদয়-জগতের যদি কোন গতি-পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে তার জন্য আমি দায়ী নই। কারণ, আমি তাঁর মাথাই সেদিন ধরেছিলাম।

সেদিন আমি ডাঃ সরকারের তীব্র শেলষে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাঁহার সরস বাচন ভঙ্গিতে মুগ্ধ না হইয়াও পারি নাই।

মহেন্দ্রবাবুর শেষ জীবনে তাঁহার সহিত আমার আর খুব বেশী দেখা হয় নাই। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেই তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া শয্যা গ্রহণ করেন—তারপর একদিন এই অনাড়ম্বর, সত্যাশ্রয়ী সাধক মরজীবনের সীমা অতিক্রম করিয়া অমরলোকে চলিয়া যান। নব্য বাংলার প্রবর্ত্তনে যে মনীষীদল অগ্রণী হইয়াছিলেন তাঁহাদের জীবনালেখ্যের সহিত ডাঃ সরকারের ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মময় জীবনের চিত্রটিও দেশবাসীর অন্তরে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

আমি যে সময়ে প্রবন্ধটি লিখিতেছি তখন পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কথা হয়ত অনেকেরই স্মৃতি হইতে প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে নব্য বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে বিদ্যাভূষণ মহাশয় একজন দিকপালরূপেই চিহ্নিত ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত সোমপ্রকাশ তৎকালে একটি বিশিষ্ট সাময়িক পত্রিকা হিসাবে খ্যাত ছিল।

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পর্কে আমার মাতুল। আমার শৈশব কালের অধিকাংশ সময়ই মাতুলালয়ে কাটিয়াছে এবং মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও মাতুল দ্বারকানাথের অপূর্ব্ব চরিত্রের মহত্ত্ব আমার জীবনকে বহুলাংশে প্রভাবান্বিত না করিয়া পারে নাই। মহান পুরুষ দ্বারকানাথের পুণ্যজীবনের কিছু স্মৃতিকথা এখানে বর্ণনা করিব।

আমার মাতুলালয় ছিল কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব্বে দশ মাইল দূরে চাংড়িপোতায়। আমি সেখানেই জন্মগ্রহণ করি এবং শৈশবের অধিকাংশ সময় কাটাই। মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তখন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক অথবা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ।

শিশুকাল হইতেই মাতামহ ও মাতুলের প্রশান্ত চরিত্র ও অগাধ পাণ্ডিত্য আমাকে অজানিতেই তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। পণ্ডিত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন তখন কলিকাতার বিদ্বজ্জন সমাজে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণরূপে খ্যাত। মাতামহ ও মাতুলের নির্দ্দেশক্রমে আমার মাতৃদেবী আমাকে পড়াশুনার জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করেন। ১৮৫৬ সালে আমি কলিকাতায় আসি এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ সে বৎসরই মাতামহের লোকান্তর ঘটে। আমি মাতুল দ্বারকানাথের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হইতে থাকি।

শিশুকালের বিচিত্র স্মৃতিগুলি আজিও ঝাপসা হইয়া মনের স্তরে স্তরে রহিয়া গিয়াছে।—দেখিতাম দ্বারকানাথের সেই প্রশান্ত মূর্ত্তির সম্মুখে কোন ব্যক্তিই উন্নত মস্তকে দাঁড়াইতে পারিত না। এমন কি আমার মা ও মাসিমারাও তাঁহার পাঠকক্ষের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকিতেন পাছে পদশব্দে তাঁহার অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটে।

তাঁহার নির্দ্দেশমত আমি যথাসময়ে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হই। সে সময় আমার পড়াশুনা কেমন চলিতেছে জানিবার জন্য তিনি সপ্তাহে দুই তিনদিন নিকটে আসিয়া বসিতেন। তিনি সামনে বসিলেই তো ভয়ে আমার কণ্ঠরোধ হইয়া যাইত। কখনো তাঁহার সম্মুখে মিথ্যা কোন কিছু বলা সম্ভব ছিল না। শিশুকাল হইতেই জানিতাম, মাতুল মিথ্যাকথাকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন, সে জন্যই

তাঁহার সম্মুখে চরম অপ্রিয় সত্য বলিতে বাধ্য হইলেও সত্যের অপলাপ কখনো করা যাইত না। এই সত্যাশ্রয়ী বিরাট পুরুষের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল এবং উহাই আমাকে উত্তর জীবনে সৎ ও সত্যবাদী হইতে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে কিশোর জীবনের একটি ঘটনা আজও মনে পড়ে।

আমার বয়স তখন বার বৎসর। কুসংসর্গে পড়িয়া এই বয়সেই আমি ধূমপান করিতে শিখি এবং গোপনে তাহা অভ্যাসও করি। একথা বাড়ীর কেহই জানিত না। একদিন কি একটি বিশেষ কাজে আমি মাতুলের পাঠকক্ষে প্রবেশ করি এবং আমার বক্তব্য তাঁহাকে জানাইতে থাকি। কথাগুলি শেষ হইবার পরও তিনি একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন—ভয়ে আমার অন্তরাত্মা তখন কাঁপিতেছে। তিনি ধীরে ধীরে আমার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন—কি ব্যাপার, তোমার গায়ে এমন তামাকের গন্ধ কেন ?

কথা কয়টি বলিয়াই তিনি আমার মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে অপরাধ অস্বীকার করিবার মত শক্তি আমার রহিল না। ভীত কণ্ঠে বলিলাম—আমি তামাক খেয়েছি।

মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার প্ররোচনায় ইহা ঘটিয়াছে ? তখনও এক মহা সমস্যা! মনে মনে ভাবিতেছি, বন্ধুদের নাম করিলে তাহাদের লাঞ্ছনা হইবে, কিন্তু না বলিয়াও তো উপায় নাই। সেই শাণিত দৃষ্টির সম্মুখে সত্য গোপন করিবার ক্ষীণ ইচ্ছাটুকুও অন্তর্হিত হইয়া গেল। এক নিঃশ্বাসে বন্ধুদের নাম বলিয়া ফেলিলাম। বলাবাহুল্য তাহাদের ও আমার উপর অজস্র তিরস্কার বর্ষিত হইতে লাগিল। অতঃপর দৃঢ়স্বরে মাতুল বলিলেন—প্রতিজ্ঞা কর, জীবনে কখনো ধূমপান করবে না।

অবনত মস্তকে সেদিন জানাইয়াছিলাম, তাঁহার এ নির্দেশ চিরজীবন পালন করিয়া যাইব। তারপর দীর্ঘদিন অতীত হইয়াছে, আমি আজ বার্দ্ধক্যের সীমানায় উপস্থিত, কিন্তু এখনও সে প্রতিশ্রুতি শ্রদ্ধার সহিতই পালন করিয়া চলিয়াছি। জীবনে আর কোনদিন ধূমপানের বস্তু স্পর্শ করি নাই।

আমার চরিত্র গঠনে মাতুল দ্বারকানাথের একটি উপদেশ বড় কার্য্যকরী হইয়াছিল। তিনি উচ্ছৃঙ্খলতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন এবং আমার আচার-আচরণের প্রতি প্রায়ই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। আমাকে বলিতেন—যৌবনের প্রাণ-প্রাচুর্য্যকে কখনো উচ্ছৃঙ্খলতার খাতে চালিয়ো না। সৃষ্টিমূলক কাজে শক্তির এ প্রবাহকে নিয়োজিত করো!—মাতুলের নিজের সুসংযত জীবনধারার প্রভাবও আমার চরিত্রকে শক্তিক্ষয়ী উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। প্রধানতঃ তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে থাকার ফলেই বাল্যকাল হইতে অজানিতে সংযমের বীজ আমার চরিত্রে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ সোমপ্রকাশ সম্পাদনায় ব্রতী হন। পণ্ডিত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন তাঁহার সহিত নানাভাবে সহযোগিতা করিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন প্রায় রোজই আমাদের গৃহে আসিতেন। কলিকাতার বাসায় তখন আমার দিদিমা ও মামীমা বাস করিতেছেন। দিদিমার নিবিড় স্নেহস্পর্শে আমার দিনগুলি বড় মধুর হইয়া উঠিয়াছিল। এই মহীয়সী নারীর কথা বলিতে গিয়া এখনও আমার সমস্ত মনটি আনন্দে ভরিয়া উঠে। বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায়, সকল প্রতিভাবান ব্যক্তির জননীই অসাধারণ গুণের অধিকারিণী। আমার দিদিমার মধ্যেও ইহা প্রত্যক্ষ করিতাম। সংরক্ষণশীল পরিবারে, বহু বাধা নিষেধের মাঝে জন্মগ্রহণ করিয়াও দিদিমা যে এত প্রাণ-প্রাচুর্য কি করিয়া পাইলেন তাহা ভাবিয়া বিস্ময়ের সীমা থাকিত না। আমার ধারণা হইয়াছে, মনীষীদের মায়েরা জন্মান্তরের সুকৃতির ফলেই সংস্কার-মুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কেবল আমার দিদিমার ক্ষেত্রেই নয়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশব সেন, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি মনীষীদের মায়েদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়া এই একই সত্য উপলব্ধি করিয়াছি। সে সময় আমার প্রায়ই মনে হইত, এই মহীয়সী মহিলাদের জীবন তথ্যাদি সঙ্কলিত হইলে আমাদের পরবর্ত্তী বংশধরেরা অবশ্যই উপকৃত হইতে পারিবে।

মনীষীদের চরিত অনুশীলন করিতে গিয়া দুইটি সর্ব্বজনীন সত্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রথমটি হইতেছে জননীদের বলিষ্ঠ, উদার ও উন্নত চরিত্র, দ্বিতীয়তঃ সন্তানদের অপূর্ব্ব মাতৃভক্তি। আমার মাতুলের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। দেখিয়াছি, মাতৃদেবীর প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ করিতে মাতৃভক্ত দ্বারকানাথ সকল সময়ে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন।

এই প্রসঙ্গে আমার মাতামহীর পুণ্যজীবনের দু'চার কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সততা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, দয়ামায়া ও স্নেহে পরিপূর্ণা তিনি ছিলেন একটি আদর্শ মহিলা। দিদিমা সাধারণতঃ চাংড়ি-পোতার গৃহেই বাস করিতেন এবং মাঝে মাঝে কলিকাতায় পুত্র দ্বারকানাথের বাসায় বেড়াইতে আসিতেন। মাতৃদেবী কলিকাতায় আসিলে মাতুলের উৎসাহের অন্ত থাকিত না, সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার সেবা যত্নের প্রতি তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার অসাধারণ মাতৃভক্তি অনেক সময় আমার বিস্ময়ের উদ্রেক করিত। ইহাও বুঝিতে পারিতাম, মাতার চরিত্র এরূপ বলিষ্ঠ ও উন্নত না হইলে এমন কৃতী সন্তানের জন্ম কখনই সম্ভব হয় না।

দিদিমার চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় গুণ হইতেছে তাঁহার অপরিসীম স্নেহ ও দয়া। কলিকাতার বাসায় আসিলেই তিনি সকলের অগোচরে আমার পকেটে ভরিয়া পয়সা দিয়া বলিতেন—যা, তোর যা কিছু খেতে বা কিনতে ইচ্ছে হয়, কিনে নে।

তিনি কলিকাতার বাসায় আসিলে ভিক্ষুকরা কি জানি কেমন করিয়া

সংবাদ পাইয়া যাইত। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাড়ীর দরজায় ভিখারীর ভীড় লাগিয়াই থাকিত—তিনি কাহাকেও ফিরাইতেন না। মায়ের এরূপ বেহিসাবী দানের যৌক্তিকতা দ্বারকানাথ অনেক সময়ই বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু তবুও তিনি কোনদিনই দিদিমাকে তাঁহার স্বেচ্ছামতে কার্য্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করেন নাই, বরং তাঁহার যখন যাহা প্রয়োজন হইত তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিতেন।

গ্রামে থাকাকালেও দিদিমার এ দান-ধ্যান চলিত। তিনি প্রতিদিন বাড়ী হইতে কিছু দূরে একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইতেন। এ সময়ে আঁচলে কিছু অর্থ লওয়ার অভ্যাস তাঁহার ছিল। কয়েকটি দুঃস্থ পরিবারকে গোপনে এ অর্থ দান না করিলে তাঁহার স্বস্তি হইত না।

কলিকাতায় আসিলে তাঁহার পথে বাহির হওয়া সম্ভব হইত না, কিন্তু দরিদ্রেরা আমাদের বাড়ীর দরজায় ভীড় করিয়া থাকিত। দিদিমার নির্দ্দেশ ছিল, কোন ভিক্ষুক যেন শূন্য হস্তে ফিরিয়া না যায়। মাতৃভক্ত পুত্র দ্বারকানাথ মায়ের এ নির্দ্দেশ পালনে কোনদিনই ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। সুতরাং দিদিমা কলিকাতায় আসিলে তাঁহার বেশ কিছু অর্থ ব্যয়িত হইত। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে কেহ কোনদিন বিরক্ত হইতে দেখে নাই। মাতৃআজ্ঞাকে কখনই তিনি যুক্তি বা বুদ্ধির তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখিতে চাহিতেন না। সব দিক দিয়া মাতা ও সন্তানের মধ্যে এমন সুন্দর সম্পর্কের দৃষ্টান্ত আমি খুব কমই দেখিয়াছি।

ইষ্টবেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের দক্ষিণ শাখা খোলা হইলে দ্বারকানাথ কলিকাতার বাসা উঠাইয়া দেন। সোমপ্রকাশ পত্রিকার আফিস ও ছাপাখানা সব তাঁহার দেশের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয় এবং এখন হইতে তিনি ট্রেণে চাপিয়া প্রতিদিন সংস্কৃত কলেজে যাতায়াত করিতে থাকেন। বাংলা দেশের গ্রামগুলি তখন ধ্বংসের পথে। দেশের শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের মন বহির্মুখীন, কাজেই গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবনে তখন যথেষ্ট ভাটা পড়িয়াছে। তাই গ্রামে বসবাস করিবার অল্পকাল মধ্যেই তিনি বুঝিলেন, স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল ও বিশৃঙ্খল।

তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, দেশে একটিও ভাল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় নাই অথচ কর্ম্ম জীবনে তখন ইংরেজির বিশেষ প্রয়োজন। এসব কথা চিন্তা করিয়া তিনি গ্রামে মধ্যবিত্ত পরিবারের বালকদের জন্য একটি উন্নত ধরণের ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন। প্রথমে সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই নিজ ব্যয়ে কয়েকজন ভাল শিক্ষক উপযুক্ত বেতনে এই নূতন বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হয়।

এইভাবে বিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং কিছু সরকারী সাহায্য পাইতেও দেরী

হইল না। কিন্তু ছাত্রদের বেতন ও সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থে বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয় সংকুলান হয় কই? অগত্যা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ নিজের উপার্জ্জন হইতেই প্রতিমাসে ঐ স্কুলে ষাট সত্তর টাকা করিয়া সাহায্য প্রদান করিতেন। অবশ্য সংস্কৃত কলেজ ও তাঁহার বহুল প্রচারিত পত্রিকা সোমপ্রকাশ হইতে তখন তাঁহার উপার্জ্জন কম হইত না।

মাতৃদেবীর দয়া ও স্নেহ এই গুণ দুইটি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার চরিত্রে সঞ্চারিত হইয়াছিল। পরের দুঃখের কথা শুনিলে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিতে কখনো তাঁহার দ্বিধা দেখা যাইত না। সংস্কৃত কলেজ হইতে মাসের দুই-তিন তারিখে তিনি তাঁহার বেতন পাইতেন, কিন্তু এ টাকা প্রথমে নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করিতেন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সময়মত বেতন না পাইলে বিপদগ্রস্ত হইবে ইহা তাঁহার জানা ছিল, তাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের কথা ভাবিয়া এই অর্থ হইতেই তাঁহাদের বেতন মিটাইতেন। এজন্য নিজে মাঝে মাঝে অসুবিধায় পড়িতেন না এমন নয়, কিন্তু কোনদিনই ইহা বড় করিয়া দেখেন নাই।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ যে কেবল নিজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সম্পর্কেই সচেতন ছিলেন তাহা নহে, কর্ম্ম জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই তাঁহার আন্তরিকতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ যে কোন ব্যক্তিরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। তিনি নিজে একটি বিশিষ্ট পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু সংস্কৃত কলেজে কেহ কোনদিনও তাঁহাকে ঐ পত্রিকা সংক্রান্ত কোন কাজ বা আলাপ আলোচনা করিতে দেখেন নাই। কলেজে আসিয়া অন্য কাজে মন দিলে পাছে কর্ত্তব্যে ত্রুটি ঘটে এই আশঙ্কার অবসর থাকিলেও তিনি পত্রিকার কাজে কখনো লিপ্ত হইতেন না।

তাঁহার অধ্যবসায়ও ছিল অসাধারণ। নিজ চেষ্টায় তিনি ইংরেজি ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং ইতিহাসের একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। কলেজের অবসর সময়টি তিনি লাইব্রেরী-কক্ষে বসিয়া নানাবিধ জ্ঞানের অনুশীলনে কাটাইয়া দিতেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী লেখক যিনি গ্রীস ও রোমের ইতিহাস রচনা করেন।

রাত্রিবেলায় দ্বারকানাথ সোমপ্রকাশের লেখা ব্যতীত অন্য কোন কাজ করিতেন না। বাড়ীর সকলে যখন নিদ্রামগ্ন তখনও তাঁহার কক্ষে আলো দেখা যাইত, রাত্রি বারোটা একটার পূর্ব্বে কোনদিনই তাঁহাকে শয়ন করিতে দেখা যাইত না। অথচ অতি প্রত্যূষেও কেহ কোনদিন তাঁহাকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখে নাই। এই বিরাট পুরুষের সমগ্র জীবনটি ছিল অনলস কর্ম্মসাধনার এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত। বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ম্মহীন জীবনের কথা কখনো চিন্তা করিতে পারিতেন না। মানুষের বহুতর ভুল বা ত্রুটি তিনি সহ্য করিতে

বা ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না কিন্তু আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

একজন মানুষ যে একাদিক্রমে এতগুলি কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারে, মাতুলকে না দেখিলে আমি সে কথা বিশ্বাস করিতাম না। সোমপ্রকাশ পত্রিকা সম্পাদনার গুরুভার ও দায়িত্ব কম ছিল না। সহকারী কর্ম্মী বলিতে ছিলেন একটি সহ-সম্পাদক। তিনি সাপ্তাহিক সংবাদ, চিঠিপত্র ইত্যাদি দেখিয়া দিতেন এবং মুদ্রণ কাজেও সহায়তা করিতেন। ইহা ব্যতীত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনা ও বিভিন্ন বিষয়ক আলোচনা, এ সবই দ্বারকানাথ স্বয়ং লিখিতেন। সোমপ্রকাশের মতামত ও প্রকাশিত ও প্রবন্ধাদি তৎকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে কম আলোড়নের সৃষ্টি করে নাই। বিশেষ করিয়া কোন সম্প্রদায় বা দলবিশেষের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় সোমপ্রকাশের মর্য্যাদা ও সাংস্কৃতিক মান যথেষ্ট উচ্চ ছিল। এই পত্রিকায় কোন প্রবন্ধ বা আলোচনা প্রকাশ করা সম্পর্কে আমার মাতুল খুব সচেতনও ছিলেন। তিনি নিজে যাহা বিশ্বাস করিতেন না, শুধুমাত্র জনমত সমর্থন করিবার জন্য কখনই তাহা প্রকাশ করিতেন না। ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক সময়ই গুরুতর বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

একটি ঘটনা এখানে প্রকাশ করিতেছি। তৎকালীন ব্রাহ্মণ সমাজে তখনও বাল্য-বিবাহ প্রথা বলবৎ রহিয়াছে। সামাজিক নানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য প্রগতিপন্থীদের অনেকেই চিন্তা করিতেছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীলদের সহিত গুরুতর দ্বন্দ্বের আশঙ্কায় কেহই তখন বিষয়টি উত্থাপন করিতে সাহসী হইতেছেন না।

ঘটনাচক্রে সে সময় একটি দুই বৎসরের কুলীন বংশীয় বালকের সহিত একটি দুই-তিন মাসের কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ঘটনাটি বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে উত্তেজিত করিয়া তুলে। তিনি পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে তীব্রভাবে এই পুরাতন প্রথাকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার এ সমালোচনাকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি দল গড়িয়া উঠিল। রক্ষণশীল সম্প্রদায়—যাঁহারা এত দিন সোম-প্রকাশের অনুরাগী পাঠক ছিলেন তাঁহারা তাঁহার ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠিলেন। তিনি কিন্তু ইহাতে বিন্দুমাত্রও ভীত হন নাই। এ আন্দোলনকে সর্ব্বতোভাবে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য তিনি তাঁহার নিজ পুত্র-কন্যাদের বাল্যকালে বিবাহ দেন নাই। পত্রিকার পাতায় পাতায় যাহা লিখিয়া চলিলেন, বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে তাহাকে রূপ দিতে তিনি পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁহাকে এ সময়ে বহু ক্লেশ সহ্য করিতে হয়।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আদর্শনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যকঠোর মনটির অন্তরালে যে একটি সংস্কারমুক্ত দরদী মন সদা জাগ্রত থাকিত সে কথা হয়ত অনেকেই

জানিতেন না। কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়া আমি তাঁহার সে পরিচয়টি লাভ করি। সেই কথাই আজ এখানে বিবৃত করিব।

আমার বয়স তখন সতের কি আঠার হইবে, সংস্কৃত কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছি। বয়সের ধর্ম্মানুযায়ী কিছু কবিতাও লিখিতেছি। পড়াশুনার সুবিধার জন্য আমি সে সময় ভবানীপুরের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সহিত বাস করি। ঘটনাচক্রে সেই পরিবারের কর্ত্তা একটি গুরুতর অপরাধের অভিযোগে চৌদ্দ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ভদ্রলোকটির দুর্দ্দশা আমার কিশোর মনকে ব্যাথাতুর করিয়া তুলে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া আমি তখন একটি কবিতাও লিখিয়া ফেলি। আমার এ কবিতাটি পড়িয়া সহপাঠীরা অত্যন্ত মুগ্ধ হয় ও সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করিবার জন্য মাতুলকে অনুরোধ করিতেও তাহারা পরামর্শ দেয়। কিন্তু তাঁহাকে ইহা বলিবার কথা চিন্তা করিয়াই ভীত হইয়া পড়িলাম। আমার কবিতা প্রকাশের আনন্দ প্রায় অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইল।

একদিন কলেজে বিদ্যাভূষণ মহাশয় শিক্ষকদের বসিবার কক্ষে বসিয়া আছেন। আমি সাহস সঞ্চয় করিয়া ত্রস্তপদে কক্ষ মধ্যে ঢুকিয়া গেলাম। লেখাটি তাঁহার হাতে দিয়া শুধু বলিলাম—সোমপ্রকাশের জন্য একটি লেখা আছে।—কাহার লেখা বা কি বৃত্তান্ত তাহা বলিবার মত সাহস আর হইল না।

পরদিন কলেজে আসিয়া তিনি আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভাবিলাম, কবিতা লিখিয়া সময় নষ্ট করিবার জন্য মাতুল নিশ্চয়ই তিরস্কার করিবেন। শঙ্কিত হইয়া নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম, কিন্তু তিরস্কারের পরিবর্ত্তে সস্নেহ কণ্ঠে তিনি বলিলেন—কবিতাটি খুব ভাল হয়েছে। আমি এ ধরণের কবিতা আরও চাই।

আমার কবিতা লেখার প্রথম পুরস্কার এভাবে মিলিল, প্রেরণাও পাইয়া গেলাম। ইহার পর বন্দী জীবনকে কেন্দ্র করিয়া রচিত একাধিক কবিতা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয় এবং এই কবিতাগুলিই 'নির্ব্বাসিতের বিলাপ' নামে সঙ্কলিত হয়।

মাতুলের নিকট হইতে এরূপ প্রেরণা ও উৎসাহ না পাইলে জীবনে হয়ত কোনদিনই আমি কবিতা লিখিতাম না। তাঁহার উদার সমর্থন ও সহানুভূতিই সেদিন আমাকে কাব্য-সাধনায় ব্রতী করিয়াছিল।

ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি দ্বারকানাথের একান্ত অনুরাগ ছিল। সত্য পালনে বা সত্য রক্ষায় যত বাধা বিপত্তিই থাকুক, তিনি নিজ জীবনে কখনও তাহা হইতে বিচ্যুত হন নাই, তেমনি কেহ সত্য পালনে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতেছে বা করিয়াছে জানিলে তিনি অমনি তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিতেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এদেশে ইঙ্গ-বঙ্গ বৈষম্য অতি

প্রবল। ইংরেজ পুরুষেরা শত অন্যায় করিলেও ভারতবাসীর পক্ষে তাহা নীরবে সহ্য করিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। যদি কোন স্পষ্টবাদী ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধে কখনো প্রতিবাদ জানাইতেন তবে রাজরোষ তাঁহার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিত।

সে সময়কার একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। আমার পিতা ছিলেন আমাদের গ্রামের বিদ্যালয়ের হেড্ পণ্ডিত। মিঃ উড্রো তখন সরকারী বিদ্যালয়ের পরিদর্শক। আমার পিতা নিজ প্রয়োজনে একখানি পত্র উড্রো সাহেবকে লিখিয়া আমাকে উহা পেঁছাইয়া দিতে বলেন। যথাসময়ে পত্রখানি লইয়া আমি সাহেবের অফিসে উপস্থিত হই, তিনি তখন পাশের কক্ষে প্রাতরাশ সম্পন্ন করিতেছেন। অফিস কামরায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে সাহেব সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আমি নমস্কার জানাইয়া পত্রখানি তাঁহার দিকে আগাইয়া দিতেই কঠোর দৃষ্টিতে তিনি আমার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, আমার হস্ত হইতে চিঠিটি কিন্তু গ্রহণ করিলেন না। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া কিছুটা বিব্রতভাবেই তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি, তিনি স্থির দৃষ্টিতে বিরক্তভাবে আমার পায়ের দিকে চাহিয়া আছেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর উড্রো সাহেব বলিলেন—তুমি চটিটি ঘরের বাইরে খুলে রেখে এসে তারপর আমার হাতে চিঠি দাও।

কিন্তু সাহেবকে চিঠি দেওয়ার সহিত চটি খোলার কোন সম্বন্ধ বা প্রয়োজনীয়তা আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। কাজেই তাঁহার ঐ প্রস্তাবে কি করিয়া সম্মত হইব? সাহেবও ছাড়িবার পাত্র নন, আমার হাত হইতে তিনি পত্র গ্রহণ করিবেন না। অতঃপর এক বাকবিতণ্ডা শুরু হইল—

উড্রো কহিলেন—তুমি আমায় অপমান করেছ।

সবিস্ময়ে বলিলাম—অপমান? কিরূপে তা করলাম?

উড্রো বিরক্ত হইয়াই বলিলেন—পায়ের চটি না খুলে পত্র দেওয়াকে আমি অপমান বলেই মনে করি।

আমার তখন বয়স অল্প, দেহে মনে তেজের অভাব নাই। সাহেবের কথা শুনিয়া স্বাদেশিকতা বোধ জাগ্রত হইয়া উঠিল। একটু তীব্র ভাবেই তাঁহার কেরাণীর পায়ের দিকে চাহিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে বলিলাম—সাহেব, তোমার কেরাণীও দেখছি জুতো পরেই তোমার সামনে চলা ফেরা করছে, এতে তুমি অপমানিত বোধ ক'রছো না?

—না, কারণ সে তো জুতো পরে আছে। তুমি কি শোননি যে, আমার কক্ষে কেউ চটি পরে প্রবেশ করে না?

শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলাম—জুতো মানুষকে সম্মান দেয় আর চটি

অপমান-এর প্রতীক, এ যুক্তির কোন তাৎপর্য্য আছে কি? এমন কথা তো আমি ইতিপূর্ব্বে কখনো শুনিনি, কাজেই তোমার এ নিয়মের মহিমাও বুঝতে পারছি না।

আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়াই তিনি পুনরায় কহিলেন—এখনও কি তুমি চটি খুলে আসবে না?

মাথা নাড়িয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলাল—তোমার কথাব কোন যৌক্তিকতা বুঝলাম না, কাজেই তা রক্ষা করতেও পারছি না। জুতো পরে ঘরে ঢুকলে যদি তুমি অপমানিত না হও তবে চটি পরে ঢুকলে কেন অপমানিত হবে? চটি আমাদের জাতীয় বেশভূষার অঙ্গ, তা তো আমরা পরবই।

—তুমি তো দেখ্‌ছি অত্যন্ত অবাধ্য। যাক্‌ সেকথা, তুমি কোথায় পড়?

—সংস্কৃত কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে।

অগত্যা পিতার প্রেরিত পত্রখানি সাহেবের টেবিলে রাখিয়া তাঁহাকে নমস্কার জানাইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। কিন্তু উড্রো সাহেবের আহ্বানে পুনরায় চটি পায়েই তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

তিনি বলিলেন—শুনেছ বোধ হয়, রাধাকান্ত দেব অত্যন্ত অসুস্থ, আমি তাঁকে দেখতে যাচ্ছি, তুমি যাবে নাকি?

—আমার ক্লাশ আছে। এমনিতেই যথেষ্ট দেরী হয়েছে, কাজেই তোমার সঙ্গে যেতে পারবো না বলে দুঃখিত।

—আচ্ছা, তুমি যদি আমার সঙ্গে রাধাকান্ত দেবের বাড়ী যাও, তা হ'লে তাঁর কক্ষেও কি চটি পরেই ঢুকবে?

—না, তাঁর কক্ষের বাইরে চটি খুলে রেখে ঢুকবো, তার কারণ ·····।

আমার কথা শেষ হইতে না দিয়াই তিনি বলিলেন—তবে আমার কক্ষে কেন তুমি চটি পরে ঢুকবে?

—সেই 'কেন'র উত্তরই তো দিতে চাইছিলাম, কিন্তু তুমি তা শুনলে কই?

উড্রো সাহেব রাগত কণ্ঠে কহিলেন—ঠিক আছে, তুমি কলেজে যাও। তোমার মত অবাধ্য বালক আমি কখনো দেখিনি।

কলেজে আসিয়া ঘটনাটি বন্ধুদের বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই খবরটি চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য আমার মাতুলেরও তাহা কর্ণগোচর হয়। দ্বারকানাথ এই ঘটনাটি কিভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা লইয়া আমার মনে নানা আন্দোলন চলিতেছিল। ইতিমধ্যে তিনি আমায় তাঁহার কক্ষে ডাকিয়া পাঠান এবং সমস্ত বিবরণ শুনিয়া আমার স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীকতায় তিনি যারপরনাই আনন্দিত হন।

তারপর ইংরেজদের এরূপ বিকৃত মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন—দ্যাখো, জীবনে কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়াবে না। জীবনে

যত কিছু বাধা বিপত্তিই আসুক, সত্যে অবিচল থাকবে।

তাঁহার নির্দ্দেশমত উড্রো সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ ও কথোপকথনটি যথাযথ ভাবে লিখিয়া দিই। অতঃপর তিনি ইংরেজ পুরুষদের হীন মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া সোমপ্রকাশে এ ঘটনাটি প্রকাশ করেন। সংবাদটি যথাসময়ে উড্রো সাহেবের নিকট পেঁীছিলে তিনি এতই ক্রুদ্ধ হন যে ভবিষ্যতে আমি যেন শিক্ষা-দপ্তরে প্রবেশের অনুমতি না পাই—এই মর্ম্মে অবিলম্বে অফিসে এক বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করেন।

আমার নির্ভীকতার প্রশংসা করিয়া মাতুল সেদিন তাঁহার নিজের তেজোদৃপ্ত চরিত্রটি আমার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। আমি তখন অপরিণতবয়স্ক যুবক, আমার স্পষ্টবাদিতা অনেকাংশে সে বয়সেরই ধর্ম্ম, কিন্তু তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তা বহু পরীক্ষিত। তিনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ গৃহস্বামী, কর্ম্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত ও দায়িত্বশীল সরকারী চাকুরিয়া। শুধু তাহাই নয়—তিনি উড্রো সাহেবেরই অধীনস্থ কর্ম্মচারী। সুতরাং এজাতীয় অপ্রিয় সত্য প্রকাশের ফলে যে তাঁহার জীবনে বহু বিঘ্ন বিপত্তি আসিবে ইহা জানিয়াও তিনি সেদিন ক্ষণেকের জন্য ইতস্ততঃ করেন নাই। তাঁহার তেজস্বিতা ও হৃদয়বত্তা সত্য সত্যই সেদিন আমার কিশোর মনে এক নূতন সুর সংযোজন করে। মাতুলের সত্যধৃত চরিত্রের আলোকে সেদিন আমি আমার জীবন-বর্ত্তিকাটি জ্বালাইয়া নিয়াছিলাম।

আদর্শবাদী পুরুষ পণ্ডিত দ্বারকানাথকে সকলেই খুব কর্ত্তব্যকঠোর বলিয়া জানিতেন। কিন্তু তাঁহার দরদী মন যে, জাতি ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলের দুঃখেই বিচলিত হইত সে খবর অনেকেই রাখেন না। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা মনে পড়িতেছে। সে সময়ে হিন্দু ও ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মধ্যে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। তদুপরি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবা বিবাহ আন্দোলন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে এক গভীর আলোড়ন তুলিয়াছে। আমরা তরুণ সম্প্রদায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কারধর্ম্মী আন্দোলনের কর্ম্মী। আমার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আমারই এক সহপাঠী বন্ধু তাঁহার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের মতের বিরুদ্ধে একটি বিধবা বালিকাকে বিবাহ করিয়া ফেলেন। বলাবাহুল্য এজন্য তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর জীবনে এবার এক চরম দুর্দ্দশা দেখা দিল। আর্থিক ও সামাজিক অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে তাঁহারা বিশেষভাবে আমার উপরই নির্ভর করিতে থাকিলেন। আর এ সম্পর্কে আমার নিজের দিক হইতেও একটি প্রকাণ্ড নৈতিক দায়িত্ব ছিল, অবশ্য এ সমস্যার জটিলতাও কিছু কম ছিল না। আমার পিতা নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁহাকে না জানাইয়া বা তাঁহার অনুমতি

ছাড়া এজাতীয় কার্য্যে যোগদান করিতে আমার মন প্রথমটায় সায় দেয় নাই। আমি তাই সমস্ত ঘটনাটির বিশদ বিবরণ জানাইয়া পিতার নিকট অনুমতি চাহিয়া পাঠাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতৃদেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রথার প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করাও পিতার দিক দিয়া অসুবিধাজনক। কাজেই তিনি আমাকে এসম্পর্কে কিছু না জানাইয়া মাতুল দ্বারকানাথকে লিখিলেন—তিনি যেন এ সব কার্য্য হইতে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন।

পিতৃদেবকে পত্র দিবার কয়েকদিন পরেই দ্বারকানাথ একদিন আমাকে তাঁহার চিংড়িপোতার গৃহে আহ্বান করিলেন। পিতার লেখা পত্রখানি দেখিলাম। এসম্পর্কে নিজের কোন মতামত না জানাইয়া, আমার কি করা উচিত তাহাই দ্বারকানাথ প্রশ্ন করিলেন। সমস্ত ঘটনাটি জানাইয়া মাতুলকে বলিলাম— আমিই উদ্যোগী হয়ে তাঁদের জীবনে এ দুঃখময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছি। আজ যদি দুর্দ্দিনে তাঁদের পাশে না দাঁড়াই তবে কি আমার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা থাকবে ?

এতক্ষণ মাতুল একটি কথাও বলেন নাই। আমার কথা শেষ হইলে তিনি সস্নেহে বলিতে লাগিলেন—তুমি ঠিক কথাই বলেছ। বন্ধুর এই দুর্দ্দিনে তাঁর নিকটে থাকাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এসম্পর্কে কোন মতান্তরের স্থান নেই—বিশেষ করে আমার ভাগ্নে হয়ে তুমি মানুষের বিপদের সময়ে কেবলমাত্র আচার-অনুষ্ঠানের ভয়ে সরে আসবে, এ আমি দেখতে চাই না। লোকাচার ও সংস্কার অপেক্ষা কর্ত্তব্য অনেক বড় বস্তু। কখনো তা' হতে বিচ্যুত হবে না।

তেজস্বী, কর্ত্তব্যকঠোর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সে দিনকার সেই সহজ সুন্দর মূর্ত্তিটি দেখিয়া ও ক্ষমাশীল মনের পরিচয় পাইয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। অতঃপর তিনিই আমার পিতার নিকট পত্র দিয়া তাঁহাকে শান্ত করেন।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়িতেছে। আমি তখন ঐ বন্ধুটির সহিত একত্রে বাস করিতেছি। আর্থিক দুর্গতি ও সামাজিক বিধিনিষেধের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া আমার স্বাস্থ্য এসময়ে প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া বন্ধুবরের গৃহ হইতে আমি চিংড়িপোতায় মাতুলালয়ে চলিয়া আসিলাম।

সেখানে আসিবার কয়েকদিন পরেই একদিন রাত্রে আমার সেই বন্ধুর শ্যালকের নিকট হইতে এক জরুরী তার আসিয়া উপস্থিত। সে রাত্রেই কলিকাতায় আমার উপস্থিতি নাকি বিশেষ প্রয়োজন। বাড়ী হইতে ষ্টেশন প্রায় ৪।৫ মাইলের পথ, রাত্রি তিনটার পূর্ব্বে কোন ট্রেণও নাই। মামীমা ও

দিদিমা ঘোরতর আপত্তি তুলিয়া বলিলেন—সে কি কথা। এত রাত্রে কি করে তোমার যাওয়া হয়, কাল সকালে বরং যেয়ো।

মহা সমস্যায় পড়িয়া গেলাম। সেই রাত্রে দিদিমার নিষেধ ঠেলিয়া যাওয়া মুস্কিল, অথচ না গেলেও কর্ত্তব্যচ্যুতির দায়ে পড়িতে হয়। উপায়ান্তর না দেখিয়া মাতুলের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি টেলিগ্রামটি পড়িয়া বলিলেন—'তারে' রাত্রেই যখন যাবার কথা উল্লেখ করা আছে তাতে মনে হচ্ছে পরিস্থিতি খুব জটিল। এমতাবস্থায় দেরী করা যায় না।

আমার প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি বলিলেন—তাছাড়া, তারা তোমার উপর যখন এতখানি নির্ভর করে তখন তো তোমার এ সম্পর্কে গুরু দায়িত্ব রয়েছে। এ অবস্থায় নিজের অসুবিধার ভয়ে কালবিলম্ব করাটা সমীচীন মনে করিনে।

আমার বন্ধুর দুর্দিনে তাঁহার এই আন্তরিক ব্যাকুলতা ও সজাগ কর্ত্তব্য-বোধ আমার সমস্ত মনকে এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া তুলিল। রাত্রির অন্ধকার ও পথের অসুবিধার কথা চিন্তা না করিয়া তৎক্ষণাৎ রওনা হইয়া পড়িলাম।

দ্বারকানাথ নিজে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার একটি সহজ সহানুভূতি ছিল। এই নবধর্ম্মের আদর্শ ও মতামতের উদারতা তাঁহাকে আকৃষ্ট না করিয়া পারে নাই। কিন্তু ১৮৬৮ সালে ব্রাহ্মসমাজে এক ভাঙন শুরু হয় এবং ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেনের নেতৃত্বে নূতন একটি সমাজ প্রবর্ত্তিত হয়। তখন হইতেই মাতুল এ আন্দোলন সম্পর্কে অনেকাংশে উদাসীন হইয়া পড়েন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন—রাজনীতি বা হাটের মত ধর্ম্মে ভাগবাটোয়ারা চলিতে থাকিলে তা' আর ধর্ম্ম থাকে না।

বিশেষ করিয়া কেশব সেনের নূতন সম্প্রদায়টি সম্পর্কে তাঁহার তেমন শ্রদ্ধা বা আস্থা ছিল না। তিনি কেশব সেনের প্রবর্ত্তিত দলের সভ্যদের ঠাট্টা করিয়া বলিতেন—'কৈশব।' কিন্তু সেই কৈশব দলেই গিয়া আমি যেদিন যোগ দিলাম সেদিনকার সে ঘটনাটি মাতুলের জীবনে যেন এক অদৃষ্টের পরিহাসের মতই মনে হইয়াছিল।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভাগিনী-পুত্র কেশব সেনের দলভুক্ত হইয়াছে—এ সংবাদ সে সময় হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় সমাজেই এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। আমাদের সমগ্র পরিবারটিই এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় মুহ্যমান না হইয়া পারে নাই। আমার মায়ের দৃঢ় ধারণা ছিল, আমাকে কেহ যদি ফিরাইতে পারেন, তিনি একমাত্র মাতুল দ্বারকানাথ। তিনি তাই চিংড়িপোতায় মামার নিকট ছুটিয়া আসিলেন; আমাকে সেখানে ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হইল। এমনিতে

যত দৃঢ়চেতাই হই না কেন, মাতুলের সম্মুখীন হইতে মনে মনে ভীত হইয়া উঠিলাম।

দ্বারকানাথ তাঁহার অধ্যয়নকক্ষে আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখি তিনি প্রশান্তভাবে বসিয়া আছেন, মুখে কোন প্রকার অস্বাচ্ছন্দ্য বা অসন্তোষের চিহ্নমাত্র নাই। আমি যাইতেই আমায় বসিতে বলিলেন এবং ধীর কণ্ঠে আমার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের অযৌক্তিকতা বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহার যুক্তি এত দৃঢ় ও অকাট্য যে আমার পক্ষে তাহা খণ্ডন করা একপ্রকার দুরূহই ছিল, কিন্তু তবুও আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি নাই। বলা বাহুল্য, মাতুল অতিশয় দুঃখিত হন।

পরে শুনিলাম, তিনি আমার পিতাকে পত্রে জানাইয়াছেন—শিবনাথ মানসিক বিকারে ভুগছে বলেই আমার বিশ্বাস। তার ধর্ম্মোন্মাদনা যুক্তি-তর্কের সীমার বাইরে। বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাকে এ পথ হতে প্রতিনিবৃত্ত করা যাবে না।

সেদিন নিজ জীবনের গতিবেগে অপরের কথা ভাবিবার অবসর পাই নাই, কন্তু পরবর্ত্তীকালে মাতুলের সেই প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তির স্মৃতি বহু সময়ই আমায় ব্যথিত করিয়াছে।

আশা বস্তুটির এমনই একটি সৃজনী ক্ষমতা আছে, যাহা চরম অসম্ভবের মধ্যেও নূতন সম্ভাবনার সূত্র খুঁজিতে চায়। মাতুল দ্বারকানাথের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তিনি ভাবিতেন, হয়তো একদিন আমার মতবাদ পরিবর্ত্তিত হইবে এবং আমি আবার ফিরিয়া আসিব। সেদিনকার ধর্ম্মান্তর গ্রহণকে কেন্দ্র করিয়া মাতুলের সহিত আমার দৃশ্যতঃ কোন বিচ্ছেদ ঘটে নাই সত্য, কিন্তু আদর্শ ও মতবাদের ব্যবধান পরস্পরকে ক্রমে কিছুটা দূরে সরাইয়া দেয়।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আমি ডিষ্টিংশান লইয়া বি, এ, পাশ করিলে আমাকে কেন্দ্র করিয়া মাতুলের মনের একটি প্রচ্ছন্ন বাসনা চরিতার্থতার পথ খুঁজিতে থাকে। ঘটনাটি অবশ্য আমি অনেক পরে জানিয়াছি। আমরা যখন কলেজে পড়িতেছি সেই সময় তৎকালীন লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের সহিত সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যালের বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। তিনি প্রিন্সিপ্যালকে জানান, সরকারী আদালতে ইংরেজ বিচারকদের বিচারের সুবিধার জন্য একজন হিন্দু-আইনজ্ঞ বাঙ্গালীর প্রয়োজন। যদি তাঁহাদের কলেজের কোন ছাত্রের এরূপ ডিগ্রী থাকে তিনি তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিতে পারেন। প্রস্তাবটি যথানিয়মে দ্বারকানাথের গোচরীভূত হয় এবং প্রিন্সিপ্যালের অনুরোধে তিনি আমাকে আইন পড়িতে বলেন। আমিও নিয়মিত ভাবে আইনের ক্লাশ করিতে থাকি এবং ইত্যবসরে এম, এ, পরীক্ষা পাশ করি।

মাতুলের মনে হইয়াছিল, ধর্ম্মবিষয়ে মতান্তর ঘটিলেও আমি হয়ত পরীক্ষার পর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহার পত্রিকা ও বিদ্যালয়ের কার্য্যভার গ্রহণ করিব এবং তাঁহাকে কিছুটা ভারমুক্ত করিব। আমি এম, এ, পাশ করিবার পর তিনি আমাকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিবার কথাও মনে মনে স্থির করিয়া ফেলেন।

কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্যরূপ। প্রথমতঃ মাতুলের মনোগত ইচ্ছার কথা আমি জানিতাম না, দ্বিতীয়তঃ দেশের কল্যাণ সাধনের উৎসাহে আত্মীয়-স্বজনের চিন্তা তখন আমার মনে গৌণ হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ও প্রসারে আত্মোৎসর্গ করিবার ইচ্ছা জানাইয়া আমি একদিন ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেনের উদ্দেশে এসময়ে গোপনে একটি পত্র প্রেরণ করি। কেশববাবু সানন্দে সে পত্র গ্রহণ করেন ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নারী শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকের পদে আমায় নিযুক্ত করেন। তখন পর্য্যন্ত আমার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে আমার আত্মীয়স্বজনেরা কিছুই জানিতেন না।

ক্রমে কাজে যোগ দিবার সময় আসিয়া পড়িল, সুতরাং এইবার মাতুলকে জানাইতেই হয়। একদিন তাঁহার কক্ষে সংবাদটি দিবার জন্য উপস্থিত হইলাম। মনে তখন খুবই শংকা জাগিতেছে, হয়ত বা তিনি এই কর্ম্মে যোগদানে ঘোরতরভাবে বাধা দিবেন। কক্ষে প্রবেশ করিয়া বক্তব্য বিষয় বলিলাম। উত্তরের জন্য তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি, সে মুখে কোন তিক্ততা বা আশাভঙ্গের রেখাপাত হয় নাই। তিনি সহজ গাম্ভীর্য্যে আমার প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। মাতুলের সেদিনকার এই উদাসীনতা কিন্তু আমার মনকে বড় তীব্রভাবে আঘাত করিয়াছিল। দেশসেবার সমস্ত উৎসাহ উদ্যম যেন ক্ষণেকের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল। অবশ্য মাতুলের বেদনার তীব্রতাটি আমি সেদিন অনুভব করিতে পারি নাই।

নানা ব্যস্ততার মধ্যে এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। আত্মীয় স্বজনের সংবাদ লইবার বড় বেশী অবকাশ পাই নাই। একদিন খবর পাইলাম মাতুলের ভগ্নস্বাস্থ্য সকলের উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে। সোমপ্রকাশ ও বিদ্যালয়ের কার্য্য এককালে চালনা করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

কালবিলম্ব না করিয়া চিংড়িপোতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।—দ্বারকানাথের ভগ্ন স্বাস্থ্য আমাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তাঁহার স্বাস্থ্যের এ অবস্থার জন্য নিজেকে সেদিন অপরাধী মনে না করিয়া পারি নাই। ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলাম—আমি পত্রিকা ও বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনি নির্ভাবনায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে চলে যান।

এমনিতে তিনি হয়ত অভিমানবশতঃ সেদিনও আমার নিকট কোনরূপ সাহায্যের কথা তুলিতেন না। কিন্তু আমার আন্তরিকতা ও সমবেদনা দ্বারকা-

নাথের মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া দিল। তাঁহার সেদিনকার চেহারাটি আমি বহুদিন ভুলিতে পারি নাই। এই প্রশান্ত গম্ভীর বৃদ্ধের অন্তরের গোপন লোকে একটি প্রচ্ছন্ন বেদনা লুক্কায়িত ছিল, ইহা তাঁহাকে অহরহ নিপীড়িত করিতেছিল। আমার সহানুভূতির পথ বাহিয়া আজ তাহা নিজেকে প্রকাশ করিল ও ভারমুক্ত হইল। বুঝিলাম, কেশবচন্দ্রের নারীশিক্ষালয়ে আমার কর্ম্ম-গ্রহণ বৃদ্ধকে কি তীব্রভাবে আঘাত করিয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও মনে হইল যে, আমিই হয়ত বা তাঁহার এ স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য দায়ী।

কেশব সেনকে সব কথা জানাইয়া পত্র দিই ও নূতন বৎসরে উক্ত পদের জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবার জন্য অনুরোধ জানাই। আমার ব্যক্তিগত সমস্যার গুরুত্ব বুঝিয়া তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। মাতুলের কার্য্যভার সেদিন নিজ স্কন্ধে তুলিয়া নিয়া ও তাঁহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া আমি কতকটা তৃপ্তি লাভ করিলাম।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত ছিল চিংড়িপোতার নিকট-বর্ত্তী হরিনাভি গ্রামে। তাঁহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বাহিরে পাঠাইয়া দিয়া আমি তাঁহার বিদ্যালয়, পত্রিকা ও গৃহের পরিচালকরূপে হরিনাভিতে বাস করিতে থাকি।

এক বৎসর ব্যাপিয়া এই গুরু দায়িত্বভার বহন করিবার পর আমারও স্বাস্থ্যের খুব অবনতি ঘটে, কাজেই অতঃপর এখান হইতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হই। ইহার পর সাউথ সুবার্ব্বণ স্কুলে শিক্ষকতার কাজ লইয়া ভবানী-পুরে বসবাস করিতে থাকি, কিন্তু পত্রিকার দায়িত্ব তখনও আমার উপর ন্যস্ত ছিল। কলিকাতা হইতে প্রেসের কাজ দেখা-শুনা করার অসুবিধা বুঝিয়া আমি প্রেসটি কলিকাতায় স্থানান্তরিত করি। দ্বারকানাথ বেনারস হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার কার্য্যভার গ্রহণ করিলে আমি অনেকাংশে ভারমুক্ত হই।

সোমপ্রকাশ যথানিয়মে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ইতিমধ্যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'কল্পদ্রুম' নামে আর একখানি মাসিকপত্রও প্রকাশ করেন। তাঁহার লেখনী নৈপুণ্যে এবং মনস্বিতা ও উন্নততর আদর্শের স্পর্শে কল্পদ্রুমও অতি অল্পকাল মধ্যে বাংলার শিক্ষিত সমাজে খ্যাতি অর্জ্জন করে।

বাংলার পত্রিকার এ জাতীয় প্রচার, প্রসার ও সাংস্কৃতিক উন্নতি লক্ষ্য করিয়া ইংরেজ রাজপুরুষগণ কিছুটা শঙ্কিত হইয়া উঠেন। এই সময়ে লর্ড লীটন বাংলা পত্রিকাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে 'ভার্ণাক্যুলার প্রেস অ্যাক্ট' প্রবর্ত্তন করেন। সরকারের এই অন্যায় মনোবৃত্তির প্রতিবাদ স্বরূপ তেজস্বী দ্বারকানাথ তাঁহার সোমপ্রকাশ পত্রিকা মুদ্রণ বন্ধ করিয়া দেন। শিক্ষিত বাঙালী সমাজে সোমপ্রকাশ সে সময়ে যথেষ্ট প্রেরণা যোগাইত—তাই ইহা বন্ধ হইবা-মাত্রই দেশব্যাপী এক তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

পরবর্ত্তী শাসক, কূটনীতিজ্ঞ স্যর অ্যাশ্‌লী ইডেন দেশের হাওয়া লক্ষ্য করিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠেন। মাতুল দ্বারকানাথকে এ সময়ে তিনি এক গোপন বৈঠকে আমন্ত্রণও জানান। ইডেনের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সোম-প্রকাশ পুনর্মুদ্রিত হইতে থাকে। অতঃপর দ্বারকানাথের পত্রিকার পূর্ব্বতন ঔজ্জ্বল্য ও আকর্ষণ কিন্তু দিন দিনই কমিয়া যাইতে থাকে। ইহার কারণও ছিল স্পষ্ট। বয়স ও স্বাস্থ্যহানির ফলে মাতুল নিজে পত্রিকাটির সকল দিক দেখিতে পারিতেন না—বেতনভুক কর্ম্মীদের দ্বারাই উহার অধিকাংশ কার্য্য পরিচালিত হইত। ফলে দ্বারকানাথের প্রাণবন্ত ও মর্ম্মস্পর্শী পত্রিকা সোম-প্রকাশের লেখায় ক্রমে গতানুগতিকতার ছাপ পড়িতে থাকে।

এই সময় কাশীধামের বিশ্বনাথ মন্দিরের পুরোহিতদের অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার লেখনী নিয়োজিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ "বিশ্বেশ্বর বিলাপ"-এর কষাঘাত তখনকার শিক্ষিত সমাজে কম আলোড়নের সৃষ্টি করে নাই।

দ্বারকানাথের সমগ্র জীবন ছিল সত্যধৃত—সত্য রক্ষার প্রতি নিষ্ঠার এতটুকু অভাব আমি কোনদিন তাঁহার মধ্যে দেখি নাই। বহু বিরুদ্ধ পরিবেশ ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার এই পবিত্র ব্রতটি সযত্নে উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন, ক্ষণেকের জন্যও ইহাতে তাঁহার কোন শৈথিল্য দেখি নাই।

বিরাট পুরুষ দ্বারকানাথের জীবনের একটি ঘটনার কথা আজ বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে। আমি তখন চিংড়িপোতায় বাস করিতেছি। এক দিন সকালে তিনি কলিকাতায় আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এমন সময় হঠাৎ গ্রাম পথে একটি নিম্নশ্রেণীর অল্পবয়স্কা বিধবা তরুণীর কাতর ক্রন্দনে তিনি সচকিত হইয়া উঠিলেন। যুবতীটি আমাদের কাছ দিয়াই যাইতেছিল। দ্বারকানাথ তাহাকে থামাইয়া তাহার বিপদের কথা জানিতে চাহিলেন।—গ্রামেরই একটি দুর্ব্বৃত্ত ধনী ব্যক্তির প্রলোভনে পড়িয়া সে তাহার সতীত্ব ও সকল কিছু হারাইয়াছে, বর্ত্তমানে সে তাহার গর্ভস্থ সন্তানটি বিনষ্ট করিবার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় সেই দুর্ব্বৃত্ত তাহাকে গৃহ হইতে নির্ম্মমভাবে তাড়াইয়া দিয়াছে। সমস্ত কাহিনীটি সে দ্বারকানাথের নিকট অকপটে ব্যক্ত করিল ও ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল।

ঘটনাটি অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। আমরা হইলে হয়ত এই রমণীটির প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল হইতে পারিতাম না। কিন্তু মাতুলের মত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কাহিনীটি শুনিয়া হঠাৎ এ রমণীর দুঃখে বিচলিত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর নিজ ব্যয়ে ধনীর বিরুদ্ধে তিনি সেই বিধবাকে দিয়া খোরপোষ দাবীর মামলা আনয়ন করেন। বিচারে শেষ পর্য্যন্ত এ মামলায় জয় হয়। বঞ্চিতা রমণীটি দুরাত্মা ধনীর নিকট হইতে নিয়মিত মাসোহারা পাইতে থাকে। এই ঘটনাটি

মাতুলের আদর্শনিষ্ঠা ও মানবপ্রেমের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন। ইহা হইতে একটি বাস্তব শিক্ষা সেদিন প্রাপ্ত হইলাম। অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখিয়াছি, মানুষের প্রকৃত দুর্দ্দিনে তিনি কখনই আচার-আচরণের চুলচেরা বিচার লইয়া বসিতেন না, মানব কল্যাণের জন্য এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত দরদ লইয়া দুর্গতের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে মাতুল একদিন তাঁহার অধ্যয়নকক্ষে বসিয়া আছেন। এমন সময় খবর পাইলেন, তাঁহারই এক প্রতিবেশী কিছুদিন যাবৎ একটি বিধবা ও তাহার শিশু সন্তানের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করিতেছে। একদিন সেই দুর্বৃত্ত নাকি বিধবাটির কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অপমান করিতেও উদ্যত হয়। ঘটনাটি শ্রবণ করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই তিনি বিধবার গৃহ অভিমুখে ছুটিয়া যান এবং ঐ প্রতিবেশীকে এমন শিক্ষা দেন যে, জীবনে আর কোনদিন সে এরূপ অসৎ কর্ম্মে আর প্রবৃত্ত হয় নাই।

দ্বারকানাথের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। তিনি আশা করিয়াছিলেন, আমি হয়ত সোমপ্রকাশ পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করিব কিন্তু বাস্তবতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। আমি আবার মহা উৎসাহে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার ও সংগঠনে আত্মনিয়োগ করি। এক অব্যক্ত বেদনা ও অভিমান বৃদ্ধকে ক্রমশঃই পীড়িত করিয়া তুলে। তথাপি তিনি একদিনের জন্যও আপন কর্ত্তব্য সাধনে বিরত হন নাই। অতঃপর দীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনের অবসানে এই কর্ম্মযোগী চির প্রার্থিত অমৃতলোকে প্রস্থান করেন।

নব্য বাংলার সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জীবনে দ্বারকানাথের অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে হইতেই তিনি বাঙ্গালীর, বিশেষ করিয়া গ্রামবাসীদের নৈতিক জীবনের শৈথিল্য লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত বিচলিত হন এবং জনজীবনে ধর্ম্মের ধারাটি পুনঃপ্রবাহিত করিবার জন্য নিজ গৃহে নিয়মিত কীর্ত্তন, কথকতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই তিনি কীর্ত্তন বা কথকতার অনুষ্ঠানে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেন। জনহিতকর্ম্মে উৎসর্গীকৃত তাঁহার এ মহাজীবনের স্মৃতি দেশবাসীর হৃদয়ে চিরজাগরূক না থাকিয়া পারিবে না।